খবর সোজাসুজি

উৎসব সংখ্যা ২০২৩

KHABOR SOJASUJI

Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)

স্বত্বাধিকারী,মুদ্রক ও প্রকাশক - ইসরাইল মল্লিক
সম্পাদক ঃ ইসরাইল মল্লিক
মুদ্রণ সহযোগী - বর্ষা পাবলিকেশন
বিন্যাস ও অলংকরণ - জয়ন্ত দত্ত
প্রচ্ছদ শিল্পী - আশীষ চন্দ্র

খবর সোজাসুজি'র পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের পত্রিকার পক্ষ থেকে জানাই শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা —

প্রকাশক, খবর সোজাসুজি

খবর সোজাসুজি'র পক্ষে ইসরাইল মল্লিক কর্ত্তৃক গ্রাম -মথুরাপুর, পোঃ- শিপতাই, থানা- জামালপুর, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১২৩০৮ পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত।

মূল্য ঃ ১০০ টাকা

Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com

উৎসব সংখ্যা ২০২৩

সূচিপত্র

ছোটগল্প

১.মহিলা পুলিশ - পার্থ পাল-৭
২.বাগান বাড়ির ভূত - বিজন গঙ্গোপাধ্যায়-৯
৩.হাউস ওয়াইভ - ড.শমিতা ভট্টাচার্য -১১
৪.ঋণ - রাফিয়া সুলতানা -২১
৫.গাছ - রমাকান্ত পাঁজা-৩১
৬.ডাইরির পাতায় যদি বেঁচে যাই - মীনা রায় বন্দ্যোপাধ্যায়-২৫
৭.আর্দশ মা - রমাকান্ত পাঁজা-১৩
৮.মাস্টার মশাই - ড.শমিতা ভট্টাচার্য-১৯

অনুগল্প

১.ডাক পাখিয মাংস - অভিজিৎ রানা -১৮
২.বোতাম - সুবিমল সোম -২৭
৩.শিক্ষা গুরু - পার্থসারথি মহাপাত্র-২০

প্রবন্ধ

১.যাত্রা-কথা - প্রভাস পাল-২৬
২.অমৃতের উৎস সন্ধানে - জয়ন্ত বারিক-২৩
৩.ভারতবর্ষের মাটিতে চোখ রাখুন - চঞ্চল সিংহরায় -২৮
৪.বয়ে চলো নদী - পার্থ পাল -২৯

কবিতা ও ছড়া

১. কাশফুল - সুনীতি মুখোপাধ্যায়-৩২
২.আমায় লোকে ছাড়তো কি? - রাম চট্টখুণ্ডী-৩২
৩.লঘু গুরু - সুব্রত মিত্র রানা-৩২
৪.তোমাকে খুঁজতে গিয়ে - মমতা চক্রবর্তী-৩২
৫.দাবদাহ - সৌরভ আয-৩০
৬.কাব্যিক প্রতিশোধ - বিশ্বজিৎ সিনহা-৩৩
৭.মা তুমি ভালো নেই - অভিজিৎ পাত্র-৩৩
৮.অনুগত - অরুণকুমার মান্না-৩১
৯.স্বপ মাখা প্রকৃতির বিধান - অখিল চন্দ্র পাল-৩৩
১০.ছায়া পথিক - শেখ সিরাজ-৩৪
১১.শরৎ রানি - দীপঙ্কর বৈদ্য-৩৪
১২.ভালোবাসার দিগন্ত - তরুন কুন্ডু-৩৪
১৩.সময় ঋণ - শম্পা ঘোষ-৩২
১৪.রুক্মিনীর দ্বিতীয়তা - মাধুর্য্য দত্ত-৩৫
১৫.ফিরিয়ে দাও - বিদ্যুৎ ভৌমিক-৩৬
১৬.বর্ণের বন্ধ্যাত্ব - বন্দনা মালিক-৩৬
১৭.একটু মিষ্টি করে হেসো- সুফি রফিক উল ইসলাম-৩৬
১৮.এই শরতে - সিদ্ধেশ্বর দত্ত-৩৬
১৯.এ এক অন্য চিলেকোঠা - রাসমণি ব্যানার্জী-৩৭
২০.ঋণ - দেবীদাস নন্দী-৩৫
২১.স্মৃতি - জ্যোৎস্না হালদার-৩৭
২২.স্বরাজের ভাবনা - ডাঃ সেখ সাবের আলি-৩৮
২৩.অভিমান - মন্দিরা মুখার্জী ব্যানার্জী-৩৮
২৪.রবীন্দ্রনাথ - গোপালী গঙ্গোপাধ্যায়-৩৮
২৫.মানুষ - বিভু মুখোপাধ্যায়-৩৯
২৬.ভাবনার ছুটি - রাফিয়া সুলতানা-৩৯
২৭.যখন বর্ষা এলো - সেখ মহম্মদ ইউনুস-৩৯
২৮.আমি নারী - বিশ্বেশ্বর চন্দ্র-৪০
২৯.নববর্ষা - বন্দনা মালিক-৪১
৩০.প্রাণ সঞ্চার - ড.শমিতা ভট্টাচার্য-৪১
৩১.বৃষ্টি এলে - দীপঙ্কর বৈদ্য-৪২
৩২.ঝড় এসেছে - মীনা রায় বন্দ্যোপাধ্যায়-৪২
৩৩.পাঠাগার - বিভু মুখোপাধ্যায়-৪২
৩৪.খবর সোজাসুজিকে - সুনীতি মুখোপাধ্যায় -৩০
৩৫.দেখা- সুব্রত মিত্র রানা -৩৭
৩৬.মন্দ কথা - শ্রীমন্দ-৩০,৩৪,৩৭,৪১

ছোটদের পাতা

১.দুটি গাছের গল্প - ইরফান মল্লিক-২৭
২.ভাই এর দুষ্টুমি - প্রাপ্তি পাল-৩৫
৩.গাছ - স্নেহা মল্লিক-৪১

সংযোজন - লেখক পরিচিতি

লেখক পরিচিতি

১.সুনীতি মুখোপাধ্যায় - পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের ইলামপুর গ্রামের বাসিন্দা।রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক,বেতার-নাটক এবং সঙ্গীতালেখ্য রচনায় সর্বভারতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সহ বহু পত্রিকা-পুরস্কারে সম্মানিত, আকাশবাণী কলকাতা, জামসেদপুর এবং আগরতলা কেন্দ্রের স্বীকৃত গীতিকার এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা।

২.রাম চট্টখুণ্ডী - বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক।জন্ম ২৩ জানুয়ারি,১৯৩৩, হুগলি জেলার গুড়াপে।লিখেছেন 'সন্দেশ', 'শুকতারা' 'কিশোর ভারতী' প্রভৃতিতে। প্রকাশিত হাসির গল্পের বই 'দ্রৌপদী দাদুর দ্বাদশী' এবং ছড়ার বই 'বিদূষক'।

৩.সুব্রত মিত্র রানা - জন্ম ১৯৭২। পিতৃভূমি বর্ধমান শহর, কৈশোর থেকে মাতৃভূমি গুড়াপ, হুগলির বাসিন্দা। আত্মপ্রকাশ 'শুকতারা'য়। লিখেছেন 'সন্দেশ', যুগান্তর, 'চাঁদের হাট, কিশোর বাংলা প্রভৃতিতে।কবিতা প্রকাশিত হয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত 'কৃত্তিবাস', 'তাঁতঘর', 'কাহ্ন' 'কৃতি এখন'র মত বিভিন্ন লিটিল ম্যাগাজিনে।প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ- 'উপগ্রহের ডাক বাক্সে'।

৪. ডাঃ সেখ সাবের আলি - জন্ম ৭ ফেব্রুয়ারি,১৯৬১, পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না থানার শ্যামসুন্দরে। কবিতা, গান, গল্প ও ছড়া লেখক।

৫. ড.শমিতা ভট্টাচার্য - প্রাক্তন অধ্যক্ষ,এমজিএডি কলেজ, শিলচর ,আসাম।প্রকাশিত বই - ১টি , গল্প , কবিতা , প্রবন্ধ নিয়মিত আসাম , ত্রিপুরা ,পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৬.মমতা চক্রবর্তী - জন্ম ১৯৭৪ সালে আসামের কাছাড় জেলার ফুলেরতলে । বাবার নাম স্বর্গীয় মনিন্দ্র চক্রবর্তী এবং মায়ের নাম স্বর্গীয় মিনতি চক্রবর্তী। বাবা খুব সুন্দর কবিতা লিখতেন।বাবার অনুপ্রেরণাতেই মূলত কবিতায় হাতেখড়ি।

৭.অখিল চন্দ্র পাল - জন্ম ১৮ জানুয়ারি ১৯৫৫ সালে আসামের করিমগঞ্জে। পেশা ব্যবসা।নেশা কবিতা লেখা।দেশ বিদেশের প্রচুর পত্রিকায় লেখা প্রকাশ হয়েছে।এখন পর্যন্ত দুটা কবিতা গ্রন্থ বের হয়েছে।

৮.সৌরভ আষ -হুগলি জেলার ধনিয়াখালি ব্লকের গুড়াপ গ্রামের বাসিন্দা।জন্ম মাতুলালয় বদনগঞ্জে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ করেছেন।লেখা ও গানের প্রতি ছেলেবেলা থেকেই ঝোঁক।

৯.পার্থ সারথি মহাপাত্র - পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর স্টেশন পাড়ার বাসিন্দা।মূলত কবিতা ও গল্প নিয়ে ব্যস্ত। দুটি কবিতার বই 'হামি বড় মুকরুর ছা' ও 'ক্ষুধার স্পর্শে বর্ণমালা কেঁপে যায়' প্রকাশিত হয়েছে। তিরিশ বছর ধরে নানান পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়ে আসছে।

১০.বিশ্বজিৎ সিনহা - বিশিষ্ট কবি ও আবৃত্তিকার। হুগলির কোন্নগরের বাসিন্দা।

১১.মীনা রায় বন্দ্যোপাধ্যায় - গল্প, প্রবন্ধ, পত্র,ছড়া, কবিতা লেখেন।হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে বসবাস।

১২.অভিজিৎ পাত্র- জন্ম ১৯৯২ সালের ১৮ মে। হুগলি জেলার সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত মামুদপুর(উঙ্গ) গ্রামে বাসিন্দা। লেখালেখি ছোট থেকেই।

১৩.দেবীদাস নন্দী - জন্ম ১৯৫৫। গল্প, কবিতা, অণুগল্প,
ভ্রমণ,প্রবন্ধ ও উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। হুগলির পান্ডুয়ার নমাজগ্রামের বাসিন্দা।

১৪.সুবিমল সোম- জন্ম-১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে, হুগলি জেলার সিঙ্গুর থানার পহলামপুর গ্রামে। বাংলায় এম.এ.। পেশা গৃহ শিক্ষকতা। লেখালেখি শুরু ছাত্রাবস্থা থেকেই।

১৫.রাসমণি ব্যানার্জী - হুগলির হরিপালের বাসিন্দ।

ছেলেবেলা থেকেই লেখালেখির সখ।পেশায় একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার।

১৬.পার্থ পাল - হুগলি জেলার গুড়াপ থানার মৌবেশিয়ার বাসিন্দা।পেশা শিক্ষকতা।নেশা সংস্কৃতিচর্চা।বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, সংবাদপত্রে চলে নিরন্তর লেখালেখি। বক্তব্য রাখতে ভালবাসেন।

১৭.অরুণকুমার মান্না - ৪ ঠা মার্চ ১৯৭১, হুগলির তারকেশ্বর থানার বিনগ্রামে। খুব ছোট থেকেই সাহিত্য সেবায় মগ্ন।

১৮.অভিজিৎ রানা -জন্ম - ১২ জুলাই,১৯৮৪, হুগলি জেলার গুড়াপের পলাশী গ্রামে।পেশা ও নেশা-শিক্ষকতা,লেখালেখি ও পরিবারকে সময় দেওয়া।

প্রিয়,আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ মুহুর্ত - শিশু,নেতাজী ও একান্তে রবীন্দ্রসংগীত শোনার মুহুর্ত ।

লক্ষ্য - লেখার মধ্যে দিয়ে চেতনা ও মূল্যবোধ গড়ে তোলা।

১৯.দীপঙ্কর বৈদ্য - বারুইপুর চম্পাহাটির অধিবাসী।বাংলা সাহিত্যে এম.এ। সমসাময়িক নানান পত্র-পত্রিকায় কবিতা ও গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

২০.তরুন কুন্ডু - জন্ম - ১৯৬০ সালের ৪ঠা মার্চ হুগলি জেলার ধনিয়াখালী ব্লকের সোমসপুর গ্রামে।১৯৭৭সালে স্থানীয় কলেজে প্রবেশের সাথে সাথে পুরো দমে লেখালেখির শুরু।

২১.শেখ সিরাজ - হুগলি জেলার ধনিয়াখালি ব্লকের যদুপুর গ্রামে বাড়ি। জন্ম ১৯৬২ সালের ১০ এপ্রিল। লেখালেখি শুরু ছেলেবেলা থেকেই।

২২.সুফি রফিক উল ইসলাম- কবি,গল্পকার, ক্রীড়া নিবন্ধকার,ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সাংবাদিক।নেশা কবি সন্মেলন, সাহিত্যসভা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সুযোগ পেলে ছুটে যাওয়া। নিবাস পূর্ব বর্ধমানের মেমারির সুলতানপুরের পৈতৃক সঞ্চয়িতা ভবন।

২৩.বন্দনা মালিক - ১৯৭৬ খ্রীঃ ৭ ডিসেম্বর বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার সাহাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি হুগলী জেলার খাজুরদহ গ্রামে বাস করেন। তার দুটি কাব্য প্রকাশিত হয়েছে এবং একটি কাব্য ও একটি উপন্যাস প্রকাশের পথে।

২৪.বিদ্যুৎ ভৌমিক -হুগলির তারকেশ্বরের চাঁদুরের বাসিন্দা।

৭০ দশকে কবি বিদ্যুৎ ভৌমিক 'মহুয়া ' ও পরে 'মহুয়া মন 'সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনার কাজে নিবিষ্ট ছিলেন ।সেই সময় দুটি কাব্যগ্রন্থ ছাড়া ও কয়েকটি সংকলন গ্রন্থ সম্পাদনা করেছন।বর্তমানে সাংবাদিকতা করেন।

২৫.শম্পা ঘোষ - বাসস্থান তারকেশ্বর, হুগলি।পেশায় মনস্তত্ত্ববিদ,সরকারি হাসপাতালে কর্মরত। অনেক ছোটবেলা থেকে লেখালেখির শখ। ইতিমধ্যে দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যথাক্রমে

ব্ল্যাক হোল ও কিউবিক টার্ন।

২৬.গোপালী গঙ্গোপাধ্যায়(নন্দী) - জন্ম ১৭ই শ্রাবণ ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ। বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার মাধবপুর গ্রামে।শিশুদের ছড়া ও কবিতা এবং বড়দের প্রতিবাদী লেখায় কবির বিশেষ পারদর্শিতা লক্ষ্য করা যায়।

২৭.মহম্মদ ইউনুস- জন্ম- বাংলা ২রা ফাধন মঙ্গলবার ১৩৫৬ সন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কবিতা ছাপা হয়েছে। বর্তমানে মেমারি পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড (খাঁড়ো)-এ স্থায়ীভাবে বসবাস।

২৮. জ্যোৎস্না হালদার -হুগলির হরিপালের বাসিন্দা। শখ-বই পড়া, লেখালেখি করা।

২৯.প্রভাস পাল- হুগলির ধনিয়াখালি ব্লকের মৌবেশিয়া গ্রামের বাসিন্দা।গুড়বাড়ি পঞ্চায়েতের প্রাক্তন

প্রধান। এলাকায় পরিচিত যাত্রাশিল্পী। বেতার যাত্রাপালাকার। এ পর্যন্ত বেতারে সম্প্রচারিত যাত্রাপালার সংখ্যা আঠারো। বেতার নাটক ' পরাজয় ' প্রশংসিত ও পুরস্কৃত।

৩০.ইরফান মল্লিক - জন্ম - ২ জানুয়ারি,২০১৫ পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের মথুরাপুর গ্রামে।কবিতা ও গল্প লিখতে ভালবাসে।আঁকতেও ভালবাসে।বর্তমানে তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠরত।

৩১.স্নেহা মল্লিক - জন্ম - ২০ আগষ্ট,২০০৮ সালে পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের মথুরাপুর গ্রামে। ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকতে ভালবাসে।বর্তমানে নবম শ্রেণীতে পাঠরত।

৩২.প্রাপ্তি পাল - হুগলির গুড়াপ থানার মৌবেশিয়া ক্ষুদিরাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী।আঁকতে ও কবিতা আবৃত্তি করতে ভালোবাসে।গল্প বই এর পোকা।

৩৩.মাধুর্য্য দত্ত - হুগলির গুড়াপ থানার খানপুর গ্রামের বাসিন্দা। লেখালেখি আর সবুজায়নে বিশ্বাসী। কাঁটা, কডেক্সযুক্ত আর বনসাই গাছের প্রতি অনুরাগী।

৩৪.রাফিয়া সুলতানা - জন্ম বীরভূমের সিউড়ীতে ১৯৬৯ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী।

তাঁর কবিতা প্রথম বেরোয় ষষ্ঠশ্রেণীতে স্কুল ম্যাগাজিনে। প্রকৃতপক্ষে ২০১৮ সালে সাহিত্যজগতে প্রবেশের পর, তাঁর পনেরোটি কাব্যগ্রন্থ ও দুটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

৩৫.সিদ্ধেশ্বর দত্ত - হুগলি জেলার গুড়াপ থানার খানপুরের বাসিন্দা। পেশায় - শিক্ষক। ছোটবেলা থেকেই লেখালেখি করতে ভালোবাসেন।

৩৬.বিজন গঙ্গোপাধ্যায় -বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ,পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের জাড়গ্রামের আঁটপাড়ার বাসিন্দা।

৩৭.চঞ্চল সিংহরায় - বিশিষ্ট লেখক এবং প্রাবন্ধিক। জন্ম - ৫ নভেম্বর,১৯৪৯ হুগলি জেলার ধনিয়াখালি ব্লকের রোহিয়ায়।প্রথম লেখা দেশ পত্রিকায়।লিখেছেন যুগান্তর, বসুমতী, প্রতিদিন, আজকাল, শুকতারা প্রভৃতিতে।

৩৮.বিশ্বেশ্বর চন্দ্র - স্নাতক প্রথম বর্ষের ছাত্র।ছোট থেকেই লেখালেখি ও আঁকতে ভালবাসে।পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের মহিষগড়িয়া'র বাসিন্দা।

৩৯.বিভু মুখোপাধ্যায় - জন্ম - ১০ এপ্রিল,১৯৫৪ , পুরুলিয়া জেলা শহর নামোপাড়া'য়। প্রবীণ সাংবাদিক, বিশিষ্ট সাহিত্যিক, বাচিক শিল্পী।বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করেন।

৪০.মন্দিরা ব্যানার্জী মুখার্জী - পিতা গোপাল ব্যানার্জি ও দাদু কেশব চন্দ্র নাগের অনুপ্রেরণায় সাহিত্য জগতে আগমন।সমাজসেবী, ক্রীড়া,সংগীত,নৃত্য ও নাট্য জগতের মানুষ। প্রকাশিত বই 'স্মৃতির তরী'। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করেন।হুগলির ধনিয়াখালি ব্লকের গুড়াপের বাসিন্দা।

৪১.রমাকান্ত পাঁজা - পূর্ব বর্ধমান জেলার নবস্থা গ্রামের বাসিন্দা।ইতিমধ্যে কুড়িটি যৌথ কাব্য সংকলন ও একটি একক কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।কলকাতায় প্রকাশিত মন কলম সাহিত্য পত্রিকার সহসম্পাদক।বর্ধমান সাহিত্য পরিষদ ও গনতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের সদস্য।

৪২.জয়ন্ত বারিক - পেশায় উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের সহকারী শিক্ষক ও নেশায় একজন সিভিল ইনি্জনিয়ার ও সমাজসেবক।অন্যায়ের প্রতিবাদে গর্জায় তার কলম।নানান পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ে লিখে পাঠকের মন জয় করেই আনন্দ পান। হুগলি জেলার হরিপালের ধান্যহানা উত্তরপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

৪৩.শ্রীমন্দ - ছদ্মনামে প্রকাশিত।

সম্পাদকীয়

খবর সোজাসুজি'র পাঠক মহলের অনুরোধে সাড়া দিয়ে আমাদের এই উৎসব সংখ্যা প্রকাশের প্রয়াস। নবীন ও প্রবীণ লেখকদের লেখায় সমৃদ্ধ আমাদের উৎসব সংখ্যা।বরেণ্য সাহিত্যিক সুনীতি মুখোপাধ্যায় এবং শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক রাম চট্টখুণ্ডী আমাদের উৎসব সংখ্যার জন্য লেখা পাঠিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।প্রথম বছরেই আপনাদের কাছ থেকে যেভাবে সাড়া পেয়েছি তাতে আমরা অভিভূত।কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ নয়,পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকেও অনেকে লেখা পাঠিয়েছেন।সকলের লেখা বিবেচিত না হলেও সকলকে আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে লেখা পাঠানোর জন্য। ছোটগল্প, অনুগল্প, প্রবন্ধ,ছড়া ও কবিতার সমাহার এই উৎসব সংখ্যা।যদিও উৎসব সংখ্যায় কবিতা ও ছড়ার ভিড় বেশি।কারণ উৎসব সংখ্যার জন্য কবিতা ও ছড়া আমাদের পত্রিকা দপ্তরে বেশি এসে পৌঁছেছে।আমরা যথা সম্ভব চেষ্টা করেছি বেশিরভাগ ছড়া ও কবিতাকে স্থান দিতে।কয়েকজন লেখকের একাধিক লেখা প্রকাশিত হয়েছে উৎসব সংখ্যায়।নবীন ও প্রবীণ লেখকদের পাশাপাশি উৎসব সংখ্যায় রেখেছি ছোটদের পাতা। আগামী দিনে ছোট বন্ধুদের লেখার সংখ্যাও বাড়বে।আর শেষে সংযুক্ত করা হয়েছে সংক্ষিপ্ত ভাবে লেখক পরিচিতি।যে সমস্ত বিজ্ঞাপনদাতা বিজ্ঞাপন দিয়ে আমাদের পত্রিকার উৎসব সংখ্যা বের করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।আশা করি, আগামী দিনেও আপনারা এভাবে আমাদের পাশে থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

সাহিত্য ও সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলার অভিমুখে আমাদের পথ চলা।আর সেই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের উৎসব সংখ্যার প্রকাশ। আমরা কৃতজ্ঞ পত্রিকা পরিবারের সদস্যদের কাছে, পাঠকদের কাছে, বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে এবং শুভানুধ্যায়ীদের কাছে।

শাসক এবং বিরোধী,উভয় দলেরই ভাল-মন্দ নিয়ে আমরা আলোচনা-পর্যালোচনা করি। প্রয়োজনে করি গঠনমূলক সমালোচনাও। এটাই সংবাদমাধ্যমের কাজ। এতে যদি কারও রাগ হয়, আমাদের কিছু করার নেই।আমরা সোজা কথা সোজাসুজি ভাবে বলতে পছন্দ করি।যা ঘটে, তা তুলে ধরি। আমরা খবর ছাপি,চাপি না। আমরা কারও পক্ষে বা বিপক্ষে নই,আমরা জনগণের পক্ষে। শিরদাঁড়া সোজা রেখে চোখে চোখ রেখে জনগণের পক্ষে আগামী দিনেও আমরা কথা বলে যাব, কোনো প্রলোভন বা অপশক্তির কাছে আমরা মাথা নোয়াবো না - এ আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।

ইসরাইল মল্লিক
সম্পাদক, খবর সোজাসুজি

মহিলা পুলিশ

পার্থ পাল

- “ স্যার আমার খুব ভয় করছে।”

- “ কেন? ”

-“ আসলে রাতে আমি কোনদিন একা থাকিনি তো।”

-“ পুলিশ ; অথচ রাতে একা থাকেননি! আজব ব্যাপার! ”

-“ পুলিশ নয় স্যার, আমি মহিলা পুলিশ। আমার দিকটাও আপনার ভাবা উচিত। ”

-“ আপনার জন্য আমি এই সামান্য প্রিসাইডিং অফিসার এত রাতে কি করতে পারি? ”

-“ কিছুই নয়। এই আপনাদের ঘরে একটু শুতে

আগামীকাল ভোটের সময় পাহারা দেব কি করে!”

অকাট্য যুক্তি। আগামীকাল পঞ্চায়েত ভোট। সমিতিতে বিরোধী পাওয়া না যাওয়ায় ভোট হবে দুস্তরীয় - গ্রাম ও জেলায়। প্রস্তুতি সেরে, রাতের খাবার খেয়ে বাকি চারজন ভোটকর্মী গভীর ঘুমে অচেতন। প্রিসাইডিং অফিসার গৌতম বাবু চিন্তায় নির্ঘুম। এমন সময় মহিলা পুলিশ কর্মীর এমন কাতর আবেদনে ছাড়া না দিয়েও উপায় নেই। অনুমতি পেয়েই বিছানা পেতে শুয়ে পড়লেন তিনি। এবং মুহূর্তে নাক ডেকে মাত করে দিলেন স্কুল ঘর।

পরের দিন ভোট শুরু হলো অতীব শান্তিপূর্ণভাবে। এজেন্টদের বসার জায়গায় একজন বসে। বিরোধীদের দেখা নেই। কাজ নেই গৌতমবাবুও। ওনার দায়িত্বের সিংহভাগই সামলাচ্ছেন ওই সবেধন নীলমনি এজেন্ট। বোঝা গেল তাঁর দাপটে এ গ্রামে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়। তাই ভোট দেওয়ার গোপন কক্ষের প্রয়োজন পড়েনি। সকলেই ব্যালট পেপার নিয়ে এসে ওনার সামনের টেবিলে রেখে ভোট দিচ্ছেন। তারপর যথাযথ ভাঁজ করে বাক্সে ফেলছেন। নিজের ভোট নিজে দিতে পারায় জন্যই বোধহয় কেউ কোনো উচ্চবাচ্চা করছেন না। কর্মহীন গৌতমবাবু বাইরে বেরিয়ে দেখলেন, সেই মাননীয়া পুলিশ গাছের ছায়ায় বসে একমনে মোবাইল ঘাঁটছেন। তাঁর লাইন ঠিক করার কাজটি করে দিচ্ছেন একটি রাজনৈতিক দলের স্বেচ্ছাসেবকরা। গৌতমবাবু তাঁকে ভোটকক্ষের ভিতরকার ঘটনা সম্পর্কে অনুযোগ জানাতেই তিনি সোজা ব্যাটে ছক্কা হাঁকালেন। বললেন, “ ভিতরের দায়িত্ব আপনার ; বাইরের আমার। ” অগত্যা....

দুপুর গড়ালো। চব্য চোষ্য লেহ্য পেও এর মধ্যাহ্নভোজও মিটলো সুষ্ঠুভাবে। এ ব্যাপারে শাসক দল আয়োজনের কোন ত্রুটি রাখেনি। খাওয়া শেষে মিঠা পাতা মিষ্টি পান চেবাতে চেবাতে ভোটকর্মীদের একটু ঘুম এসেছিল। এমন সময় বিরোধীদলের দলবল হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ভোটকেন্দ্রে। তাদের প্রথম রোষ পরলো প্রিসাইডিং অফিসারের উপর। টেবিল চাপড়ে, উল্টে চলতে থাকল বাছাবাছা গালিগালাজ।

গালি-কালা গৌতমবাবুর ভাগ্য ভালো বিশালদেহী বিরোধীর থাপ্পড়টা ওনার গালে পরলো না। পড়লে যে কি হত ভাবতে ভাবতে ভোটকক্ষ থেকে চট্ করে বেরিয়ে বাথরুম ঘরের দরজার আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন উনি। স্কুল বাড়ির বারান্দায় তখন চলেছে তুমুল মারামারি, ঠেলাঠেলি। ঝাঁটা,লাঠি, সাইকেলের চেনের ঝনঝনানির মাঝেই শোনা গেল গাছ বোমার আওয়াজ। ধোঁয়ায় ভরে গেল চারপাশ। এরই মাঝে দেখা গেল সেই বিশালদেহী ব্যালট বাক্সদুটিকে বগলদাবা করে ছুটছে স্কুলবাড়ীর বাইরে। তার পিছনে ক্ষ্ম ধর,ধর ক্ষ্ম, ক্ষ্মপালা,পালাক্ষ্ম বলতে বলতে ছুটছে বাকি সকলে। এই ফাঁকে বাথরুম থেকে বের হলেন গৌতমবাবু। তাঁর হঠাৎ চাকরি বাঁচানোর কথা মনে পড়েছে। তাই ছুটলেন দোতলার ঘরের দিকে। যেখানে পুলিশ মহোদয়ার অস্থায়ী আবাস। গিয়ে দেখলেন, তিনি দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে। কানে ফোন। গৌতম বাবুকে দেখে তিনি দরজা খুললেন।মুখে উদ্বেগ।

-‘‘ কাকে ফোন করছেন? ’’ গৌতমবাবুর জিজ্ঞাসা।

- ‘‘ আমাদের ওসিকে। ’’

-‘‘ কি বলছেন? ’’

-‘‘ বলছেন বড় ফোর্স নিয়ে নাকি আসছেন। এসে পৌঁছাতে মিনিট পনেরো লাগবে। ’’

-‘‘ সেকি! ততক্ষণে তো প্রাণটাও থাকবে না। ’’

-‘‘ জানালা দিয়ে দেখলাম ওই ষন্ডা মতন লোকটা ব্যালট বাক্স দুটোকে পুকুরের জলে ফেলে দিলো।’’

-‘‘ এখন কি হবে? চাকরি নিয়ে টানাটানি। ’’

- ‘‘ওটা আপনার ব্যাপার। আমি জানি না। রিলিজ পেলেই আমার মুক্তি। অ্যাডভান্টেজ লেডিস।’’

এমন কথোপকথনের মাঝেই ওরা শুনতে পেলেন উত্তেজিত মানুষের দলটা হৈ হৈ করতে করতে ওদের দিকে আসছে। অর্থাৎ গণপিটুনি ছাড়া আজ মুক্তি নেই। গৌতমবাবু প্রবল উত্তেজিত হয়ে মহিলা পুলিশকে বললেন, -‘‘গুলি চালাতে পারেন?’’

-‘‘ পারি । ’’

-‘‘ তবে চালান। অন্তত ব্ল্যাঙ্ক ফায়ারটা করুন। ’’

-‘‘হবে না, স্যার। ’’

-‘‘ কেন!! ’’

-‘‘ আমাকে বন্দুক দিয়েছে ; কিন্তু বুলেট দেয়নি।’’

বাগান বাড়ির ভুত

বিজন গঙ্গোপাধ্যায়

সত্যজিৎ রায় তাঁর 'ঘরে বাইরে'র একটা শুটিং তুলে নিয়ে যাওয়ার পর থেকেই চকদিঘির বাগানবাড়িটা আবার আগের মতই নিঝুম হয়ে গেছে। একরাশ আলো আর অন্ধকার নিয়ে রোজ লুকোচুরি খেলার অভ্যাস এই বিশাল বাড়িটার। প্রকান্ড মেহগনি কাঠের তৈরি দরজা জানালাগুলো খুললেই কাঁচের শার্সির ফাঁক দিয়ে সকাল বেলার রোদ এসে পড়ে কাশ্মীরি কার্পেট মোড়া দোতলার কাঠের মেঝেয় ! ঝাড়লণ্ঠন আর ঝালর ঝোলানো ঘরগুলোয়, অতীতের ছবিগুলো কাতর মুখ নিয়ে চেয়ে থাকে যখন, একদম হিংসে করতে ইচ্ছে করে না জমিদারদের। জমিদাররা এখন কলকাতায় থাকেন।

আমাদের জামাইবাবু, দিদি আর আমি এখানে প্রায়ই বেড়াতে আসি। অনেকেই আসে এখানের বাগানবাড়ির সৌন্দর্য্য দেখতে। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই এই বাড়ির ঐশ্বর্যটুকু। এখন যদিও অবহেলা আর অত্যাচারে, অনেকটা রঙই ফিকে হয়ে এসেছে। স্তব্ধ, বিষণ্ণ পরিবেশে বাগানবাড়ির বৈঠকখানা ঘরের উত্তরের ঝুলন্ত বারান্দায়, তারের ভাঙা জালের ফাঁক দিয়ে মুখ গলিয়ে সবুজটিয়া, চন্দনা আর বিরল প্রজাতির বাক্যবাগীশ পায়রাগুলো যখন গল্পগুজোর করে, তখন হারানো অতীতের জন্য মনে মনে ভারি কষ্ট হয় !...

গত সোমবার এসেছিলুম এখানে। শুনলুম অনন্তদা কাজ ছেড়ে দিয়েছে। হরেনবাবুও যাব যাব করছেন। সত্যেনদারও বয়স হয়েছে, চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছে না। সত্যেনদা বসে ছিলো বাগানবাড়ির রোয়াকে। বিকেল চারটে। সূর্য ঢলে পড়েছে বাগানবাড়ির আমবাগানের পিছনে। বাগানবাড়ির ঘরগুলোতে তালা-চাবি দেওয়া হয়ে গেছে। সত্যেনদা বললেন - এবার উঠব ভাই, সন্ধ্যের পর এখানে আর কেউ থাকছে না। ভুতের বড় উৎপাত হচ্ছে। বৈঠকখানা ঘরের উত্তরের বারান্দায় রোজ রাত্রি হলেই দাপাদাপি করে। মনে হয় কারা যেন বল খেলছে ! আমরা একদিন দোতলায় উঠে দেখি- কেউ কোথ্থাও নেই। যেই নেমে এসেছি, অমনি আরম্ভ ! পোষা টিয়াপাখি, চন্দনা আর পায়রাগুলোও কমে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ভুতেরাই খেয়ে ফেলছে ওদের ! ....

'ভুতে পায়রা খায় !' আমি অবাক হয়ে বললুম- 'সত্যেনদা ভুতগুলো কি সত্যিকারের ভুত, না অন্য কিছু ?' সত্যেনদা একগাল হেসে বললেন- ক্ষ্লবেশ বললে ভাই, ভুত আবার সত্যিকারের নয়তো কি,একদম গেছো ভুত ! বেটারা ঐ উত্তর দিকের বারান্দার পাশের দেবদারু গাছগুলো বেয়ে দোতলার বারান্দায় ওঠে। আর ফাঁকা জায়গা দেখে ওখানেই বল-টল খেলে !....

'ভুতে বল খেলে' -কথাটা আমার কাছে একদম নতুন। সত্যেনদাকে বারবার জিজ্ঞেস করলুম- 'সত্যি করে বল খেলে ?' সত্যেনদার এক কথা- 'আমি কি মিথ্যে বলছি ভাই; বিশ্বাস না হয়, আজ একটু সন্ধ্যে পর্যন্ত থেকে যাও।দেখবে আমার কথা, সত্যি না মিথ্যে।' ...

'ভুতে বল খেলে' -- কথাটা ভাবতে ভাবতে সত্যেনদাকে কিছু না বলে বাড়ি চলে এলুম। আমাদের 'মিলন সংঘের' ডানপিটে সদস্য- রবিদার বাড়ি, আমাদের বাড়ির একটা পুকুরের পাড়। তার কাছে গিয়েই বললুম সব।রবিদাতো বেজায় খুশি; বললে- 'খেলোয়ার ভুতদের দেখা পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার রে সন্টে।' আমি বললুম ''কিন্তু ভুতগুলো যদি ঘাড় মটকে দেয়।'' রবিদা একটু থমকে গেল, তারপর বললে- 'কিছু পরোয়া নেই; বাবার বন্দুকটা খাটের তোশকের তলায় রয়েছে ; ওটা সঙ্গে নিয়ে যাব। তুই - এই জানলার কাছে দাঁড়া;আমি নিয়ে আসছি বন্দুকটা।.... রবিদার উপস্থিত-বুদ্ধি আর সাহস দেখে

আমি চমৎকৃত! তবু বুক ঢিব্ ঢিব্ করছে! শুনেছি, গুলি করলেও ভুতেরা নাকি মরে না!...

যাই হোক, রবিদার কথামত জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছি ; সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে । কিছু পরেই রবিদা চুপি চুপি জানলা গলিয়ে বন্ধুকটা আমার হাতে দিয়ে দিল। ভারি দোনলা বন্দুক। আমি ভয়ে ভয়ে বন্দুকটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি; রবিদা কখন অন্ধকারে আমার কাছে এসেছে টেরই পাইনি ; হাতে তার মস্ত একটা টর্চ। পুকুরের পাড় দিয়ে বাগানবাড়ির গেটে চুপিচুপি ঢুকে পড়লুম আমরা। কামিনী ফুল গাছের। কেয়ারির মধ্যে দিয়ে মসৃণ রাস্তায় হাঁটছি।একটু দূরেই বাগানবাড়ির বৈঠকখানাটা অন্ধকারে বিশাল দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে বাগানবাড়ির বিশাল হরিতকি গাছটার তলায় এসে পড়েছি। হঠাৎ দেখা গেল বৈঠকখানাটার উত্তরের বারান্দার কাছে দেবদারু গাছগুলোর মধ্যে একটা আলোর ঝিলিক !...

সাদা সাদা কামিনী ফুল ফোটা গাছগুলোর গায়ে চমকে সেঁটে গেলুম আমরা।

বৈঠক খানার বারান্দায় আর একটা আলো; জ্বলে উঠেই নিভে গেল! অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। শুনতে পেলুম বারান্দায় বল খেলার মত আওয়াজ হচ্ছে। বৈঠকখানার বারান্দায় কারা যেন বল খেলছে- দুপ্ দাপ্; ধুপ্-ধাপ্!... সেই সঙ্গে পখিদের আর্ত চিৎকার, ডানার ঝটপটানি! জমাট অন্ধকারে বাগানবাড়ির মধ্যে এক ভৌতিক আবহাওয়া!...

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম- 'রবিদা চলো পালাই। ওখানে ভূতগুলো নিশ্চয় পাখি ধরে খাচ্ছে!'... রবিদা আমার কথায় কান না দিয়ে, কোন কথা না বলে বন্ধুকটা বাগিয়ে ধরে অন্ধকারে এগিয়ে চলল! আমিও নিরুপায় হয়ে, পালাবার মত সাহস না থাকায় রবিদার পিছনে চলেছি। হঠাৎ সামনেই দেখি দেবদারুগাছগুলোর নিচে একটা লম্বা সাদা মূর্তি! দু'হাত উঁচু করে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! ভয়ে থমকে গেছি আমরা।বারান্দায় বল খেলার আওয়াজটাও থেমে গেছে। হঠাৎ সমুখের দেবদারু গাছটা নড়ে উঠল! দেখি, দেবদারু গাছের ডাল বেয়ে নামছে দুটো সাদা মূর্তি !....

রবিদা চুপিচুপি আমায় বলল- 'টর্চটা ধর সন্টে, আলো ফেল ওদের মুখে। ভুতেদের মুখে আলো ফেলা! আমার হাত কাঁপতে লাগল । তবু ভয়ে ভয়ে টর্চের আলো ফেললুম ওদের মুখে!...ভুত ? না, ভুতের মত সাদা কাপড়ে ঢাকা দুটো মানুষ ! চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে! দুটোর পিঠেই দুটো পাখির খাঁচা ! .....

রবিদা বন্ধুক তুলেই বলল - 'হ্যান্ডস্ আপ'... মানুষ দুটো চমকে উঠে অন্তত দশ ফুট উঁচু থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে! দেবদারু গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিটা কিন্তু একটুও নড়ে নি! টর্চের আলোয় তার আপাদমস্তক উদ্ভাসিত। পুরোপুরি একটা কঙ্কালের চেহারা; দাঁত বার করে হাসছে! রবিদা হঠাৎ বন্দুক ফেলে দিয়ে দাঁত বার করে হাসতে লাগল!...আমি ভয়ে ভয়ে বললুম- রবিদা অমন করে হাসছো কেন ?' রবিদা হাসতে হাসতে বললে- ব্যাটা বোগাস; আসল ভুতেরা পাখি চুরি করতে এসে নকল ভুতটাকে রেখে পালিয়েছেরে সন্টে।নিয়ে চল বেটাকে, মিলন সংঘের ঘরে পাহারা দেবে !''....

হাউস ওয়াইভ

ড. শমিতা ভট্টাচার্য

নীহারিকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বানিজ্য শাখায় প্রবেশের পরীক্ষা পাশ করে এবার বানিজ্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের মুখোমুখি মৌখিক আলাপচারিতায়,এই ধাপ উত্তীর্ণ হলেই এম.কম এ প্রবেশাধিকার পুরো পাকা ।

শিক্ষক - ৯২ শতাংশ, খুব ভালো, বাড়ি কোথায়?

নীহারিকা -এই শহরেই

শিক্ষক - বাবা কি করেন?

নীহারিকা (গর্বিত কণ্ঠে)- একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির প্রোডাক্ট ম্যানেজার।

শিক্ষক-- মা কি করেন

নীহারিকা - কিচ্ছু না ,হাউস ওয়াইভ।

শিক্ষক - তুমি তো বানিজ্য নিয়ে পড়বে,আগে বলো তুমি কি জানো তোমার বাবার কোম্পানিতে তিনি কোন কোন কাজ করেন?

নীহারিকা - হ্যাঁ জানি,কোম্পানির প্রোডাক্ট তৈরি হওয়া থেকে সব প্রোডাক্ট এর ডিস্ট্রিবিউশন পর্যন্ত বাবার অধীনেই হয়ে থাকে।

শিক্ষক - তোমার বাবার অধীনে কতজন কাজ করেন, (আনুমানিক) ?

নীহারিকা - (গর্বিত স্বরে) প্রায় শ- খানেক লোক তো হবেই।

শিক্ষক - আচ্ছা নীহারিকা তোমার বাবার কোম্পানির বিষয়ে তোমার এত স্পষ্ট আইডিয়া তোমার বানিজ্য শিক্ষায় খুব কাজে লাগবে ,এখন বলোতো তোমার বাবার সমান পদে কতজন আছেন,আর তারা কি কি করেন ?

নীহারিকা - পুরোটা বলতে পারবো কিনা জানি না।তবে এরিয়া ,বিজনেস রিলেশন, আউটপুট কোয়ালিটি, প্রফিট গেইন আইডিয়া এই বিষয় গুলোর জন্য না হলেও বাবার মত ৫০ থেকে ৬০ জন আছেন। এ ছাড়াও বাবার উপরে রয়েছে পুরো গভর্নিং বডি ইউনিট, যারা কোম্পানির আসল মালিক, সেখানেও প্রায় ৩০ জন আছেন।একশ্বাসে যা জানে বলে দিলো নীহারিকা।

শিক্ষক - একটু হেসে, আচ্ছা এবার বলো তোমার বাবার কোম্পানির মত তুমি যে আর একটা কোম্পানির সাথে জড়িত সেই কোম্পানির বিষয়ে তুমি কি কি দেখেছ বা কতটুকু জানো।

নীহারিকা - আর কোনো কোম্পানি তো জানি না স্যার,তবে আপনি যদি বলেন আমি স্টাডি করে...

কথা থামিয়ে আচার্য্য বললেন, নীহারিকা একটু ভেবে দেখোতো তোমার ফ্যামিলিও তো একটি কোম্পানির মত,এখানের প্রোডাক্ট হলো - তোমরা, তোমার পরিবারের স্বাস্থ্য,কাজেই রান্নাবান্না, ঘরদোর পরিষ্কার পরিছন্ন,ভালো বাজার হাট, রান্নার ক্যালোরি যুক্ত আইটেম, এইসব।

এখানেও অন্যদের সাথে রিলেশন রাখতে হয়, আত্মীয় স্বজন!তাদের খবরাখবর রাখতে হয়।

তোমার পুরো এলাকার খবর ও তার সাথে তোমার পরিবারের নিরাপত্তার কথা চিন্তা এই বিষয়টিও আছে।

তারপর হলো যারা ঘরের বাইরে থাকে, কাজ করে ঘরে ফিরে এলে তাদের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার, কোম্পানি কত খরচ করে জানো মোটিভেটরদের উপর ।এই সব কাজ তোমার ফ্যামিলি কোম্পানিতে তুমি আর তোমার বাবা কতটুকু করো??

নীহারিকা চুপ, ধীরে ধীরে বললো বাবার তো সময় নেই ঘরের কিচ্ছু করার আর আমিও পড়াশুনায় থাকি ,ঠিক সময় দিতে পারি না..

বিভাগীয় প্রধান শিক্ষক ধীরে ধীরে উঠলেন ,

নীহারিকাকে বললেন তোমার বাবার কোম্পানির ২০০জন মানুষ (তোমার বাচনিক)আর তোমার ফ্যামিলি কোম্পানির একজন!!

তবু এতটুকু সহমর্মিতা, তাঁর কাজের প্রতি গর্ববোধ কিছুই নেই,কোনো হিসেব পর্যন্ত তোমার কাছে নেই ,তুমি কি বানিজ্য পড়বে ?

নীহারিকার চোখ বেয়ে জল পড়ছে, হাত জোড় করে বললো একটি সুযোগ দিন স্যার,আমার ঘরে মাল্টি ট্যালেন্টেট এই মহিলাকে জানার,যদি পারি তাহলেই আসবো আপনার কাছে।

বিভাগীয় প্রধান হেসে বললেন, আসতে হবে না ,আমার নম্বর দিচ্ছি,তিনদিন সময় ,যদি পুরো অবজার্ভ করে জানতে পার ,তবেই অ্যাডমিশন।

খবর সোজাসুজি পত্রিকার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি -

অনিরুদ্ধ চট্টোপাধ্যায়

গোয়াই,আমড়া, দাদপুর, হুগলি

আর্দশ মা

রমাকান্ত পাঁজা

‘‘এখনো তোমার ঘরবাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলো না। আর তো মাঝে একটা দিন,তারপরই তো ওরা আসবে। কতদিন দেখিনি মেয়েটাকে। এই ফুলদানি পাল্টে নতুনটা রাখো। মেয়েটা কত ফুল ভালোবাসত। আজ পাঁচ বছর পর আবার ঈদ হবে আমাদের বাড়িতে বলো আমিনা। ’’

‘‘ হুম, তোমার জন্যই তো অহেতুক জেদ আর ঠুনক ধর্ম। পাঁচ বছর ধরে কত কষ্টই না পেলাম।’’

‘‘ আর তুমি! তুমিও তো আমার কথায় সায় দিয়েছিলে, এমন মেয়ে থাকার থেকে না থাকা ভালো..... আরো কত কি বলতে। ’’

আমিনা হাসতে হাসতে বলে,‘‘ সে রাগের মাথায় বলেছিলাম তুমি তো একটু বোঝাতে পারতে আমাকে।’’

‘‘ হ্যাঁ গো, পরে তো সবই বুঝলাম। কিন্তু রাগের জন্য অহেতুক পাঁচ বছর কষ্ট পেল মেয়েটা। ওদের নিয়ে একদিন বাজার যাব বুঝলে। আর শোনো লিসার ঘরটা, ওর বই, খাতা, আলমারী যেমনটা ছিল সুন্দর করে সাজিয়ে রেখো। ও কত গুছিয়ে রাখত দেখছো তো। না, আমি এবার যাই, আজানের সময় হয়ে হয়ে গেলো। ’’

‘‘ ওহঃ, তোমার দেখছি মেয়ের জন্য আর তর সইছে না। কি করব না করব ভেবে পাচ্ছ না। ’’

আলনায় লিসার সালোয়ার টা গোছাতে গোছাতে ভাবে, পাঁচ বছর এই ঘরটা একই রকম ভাবে পড়ে আছে কেউ ঢোকেনি। যাবার আগের দিন এই সালোয়ার টাই পড়েছিল লিসা। এটা পড়লে ওকে খুব সুন্দর লাগত, চোখের জল মুছতে মুছতে ভাবছিল আমিনা। লিসা তো বলেছিল সে তুরীন কে ভালবাসে, ওকে ছাড়া সে কাউকে সাদি করতে পারবে না। তবুও কেন যে ও অমতে ছেলে দেখতে গেলাম!

হ্যাঁ, লিসাদেরে এমনি গোড়া মুসলিম পরিবার। কলেজে পড়ার সময় তুরীনের প্রেমে পড়েছিল লিসা। তুরীন ভালো মাউথ অর্গান বাজাতে পারতো। অনেক সময় আপন মনে একা একা গাছ তলায় মাউথ অর্গান বাজাতো। আর লিসা গান ভালোবাসতো। কলেজ ফাংশনে তাদের ডুয়েট বেশ জমে উঠেছিল। তুরীনের মাউথ অর্গান এর শব্দ শুনে লিসা ছুটে যেত কৃষ্ণ প্রেমী রাধার মতো। সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ালো দুজনের ধর্ম। তুরীন হিন্দু ব্রাহ্মণ। তবুও দুজন দুজনকে মেপে নিয়েছিল বিশ্বাসের স্কেলে। তারপর তুরীন ইঞ্জিনিয়ারিং এ চান্স পেয়ে গেল আর লিসা পড়ছিল মেন স্ট্রীমে।

লিসার সেবছর মাস্টার্সের লাষ্ট ইয়ার, বাড়ি থেকে চাপ দিচ্ছিল সাদি করার জন্য। লিসার সাফ জবাব সে বিয়ে করতে হলে তুরীনকেই করবে। এদিকে হিন্দু বাড়িতে কিছুতেই বিয়ে দেবে না করিম শেখ। অবশেষে একদিন বাড়ি ছেড়ে চলে গেলো লিসা, সোজা তুরীনদের বাড়ি। তুরীনের সবে মাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং এর পাঠ শেষ করেছে কয়েকটা কোম্পানীতে ডাকও পেয়েছে, কিন্তু হঠাৎ বাবা মারা যাওয়ায় যাওয়া হয়নি তার। এমত অবস্থায় লিসা বাড়িতে এসে হাজির। তুরীনের মা কামিনী দেবীকে বলে, কাকিমা, আমি বাড়ি ছেড়েচলে এসেছি, আর ফিরে যাব না। ’’

তুরীন অবাক! বলে, ‘‘ কেনো? তোমার আব্বা আম্মা কি ভাববেন? ’’

‘‘ না, ওরা জোর করে পরশুদিনই বিয়ে দেবে বলে ঠিক করেছে, তাই আমাকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হলো। তোমাদের জানানোর সময় পাইনি। ’’

কয়েকদিনের না ঘুমোনো চোখ, অবিনস্ত্য চুল বুকে কি অসম্ভব চাপ নিয়ে এ বাড়িতে এসেছে লিসা,সেটা আার কেউ না বুঝলেও কামিনী দেবী উপলব্ধি করলেন। সদ্য স্বামী হারানোর ব্যথার গ্রাফ অতিক্রম করল এই মেয়েটির জীবন যন্ত্রণা। তুরীনের ভালোাসা আর বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে ব্যাট ধরলেন কামিনী দেবী। বললেন, ‘‘ ঠিক আছে তুমি থাকো এখানে, বাকিটা আমি সামলে নিচ্ছি। ’’

সত্যিই জীবনে কত ঝড় ঝাপটা সহ্য করে এই বয়সে এসে পৌঁছেছেন কামিনী দেবী। বিয়ের পর

থেকেই তাকে শুনতে হয়েছ বাঁজা অপবাদ। স্বামী অর্ঘ্য বাবু খুব ভালো বাসতেন কামিনী দেবীকে। তিনি জানতেন তাঁর শারীরিক অক্ষমতার কথা। বহু চেষ্টার পরও তাদের সন্তান হয়নি। কামিনী দেবী তখন নার্স। হঠাৎ একদিন হাসপাতালে একজন মা শিশু পুত্র রেখে দিয়ে চলে যায়। বাড়ির ঠিকানা ধরে হাসপাতাল কতৃপক্ষ খোঁজখবর করে। কিন্তু দেখা যায়,সেটা ভুল ঠিকানা। এই শিশুটিকে নিয়ে কি করবে বুঝতে পারে না হাসপাতাল কতৃপক্ষ। তখন কামিনী দেবীর অতৃপ্ত মাতৃত্ব জেগে ওঠে। এক বছর ধরে নার্সদের কাছে বড় হতে থাকে বাচ্চা টা। কামিনী দেবী খুব ভালোবাসত বাচ্চাটা কে। ধুমধাম করে অন্নপ্রাশন করে ছিল কামিনী দেবী নার্স কোয়ার্টারে। মায়ের যত্নেই মানুষ করছিলেন কামিনী দেবী। নাম রেখে ছিলেন তুরীন। তারপর তার বাড়ির লোকজন যখন আর নিতে এলো না। তখন সরকারি নিয়ম মেনে নিবেদিতা ট্রাস্টথেকে দত্তক নিলেন তুরীন কে। সেদিন থেকে কামিনী দেবী তুরীনের মা আর অর্ঘ্য বাবু তুরীনের বাবা।

খুব যত্ন করে মনের মতো তুরীন কে মানুষ করেছেন। ছেলেও মা অন্ত প্রাণ। কোনোদিন মায়ের কথা অমান্য করে নি। কিন্তু তুরীন কেন যেন লিসার এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছে না। লিসাকে বলে, ক্ষ্ম আমাকে যেমন আমার বাবা মা মানুষ করেছে তোমাকেও তোমার আব্বা, আম্মা মানুষ করেছেন। তাদেরকে এ ভাবে কষ্ট দিয়ে চলে আসা তোমার ঠিক হয়নি। আমি গিয়ে ঠিক তাদের বুঝিয়ে তোমায় নিয়ে আসতাম। ”

‘‘ তুমি জানোনা,ওরা হয়তো ওখানে তোমায় মেরেই ফেলত। মানুষের পরিচয় ওদের কাছে বড় না, জাতপাত-ধর্মই ওদের কাছে বড় কথা। তুমি বিশ্বাস করে আব্বু, আম্মা কে আমি কষ্ট দিতে চাই নি। কিন্তু ওরাও আমার কষ্ট যন্ত্রণার কথাটা বুঝল না!’’

কামিনী দেবী ঝড়ের আগাম আভাস পেয়ে রির্টায়ার্ড ডি,এস,পি অর্ঘ্য বাবুর বন্ধু হাবিবুর ইসলাম কে ফোন করে গোটা ঘটনাটা বলে। হাবিবুর বাবু স্থানীয় থানায় ফোন করে গোটা ব্যাপারটা জানিয়ে কামিনী দেবীকে আশ্বস্ত করেন এবং ওদের রেজিস্ট্রি ম্যারেজের ব্যবস্থাও করে দেন।

সন্ধ্যা হতেই লিসার বাড়ির লোকজন আত্মীয় স্বজন তুরীনদের বাড়ি এসে হাজির। জোর করে লিসা কে নিয়ে যেতে চায়। সেই নিয়ে বেশ বচসাও হয়। প্রাথমিকভাবে প্রতিবেশীরা রুখে দেয় জয় হয় ভালোবাসার। তার দুদিন পর হাবিবুর ইসলাম এর সহযোগিতায় রেজিস্ট্রিম্যারেজও হয়ে যায়। এমন বন্ধু না থাকলে কামিনী দেবীর একার পক্ষে এ লড়াই সম্ভব হতো না।

এদিকে তুরীনও বিভিন্ন জায়গায় ইন্টারভিউ দেয়। হঠাৎ একদিন ইন্টারভিউ দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে লিসার দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের হাতে আক্রান্ত হয়ে গুরুতর জখম অবস্থায় বাড়ি ফেরে। মা ও লিসার সেবা শুশ্রূষায় দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে। লিসা এসবের জন্য নিজেকে দায়ী করে দুঃখ পায়। কামিনী দেবী মায়ের স্নেহ আদরে ভরিয়ে দেয় লিসা কে। তুরীনকে আর কাছ ছাড়া করতে চায় না কামিনী দেবী। এই ভাবে শঙ্কায় কেটে যা আরো দুটো মাস। পুরুষ মানুষ কে তো একা একাই চলতে হয়। ব্যাঙ্গালোরে কাজ নিয়ে চলে যায় তুরীন। প্রথম ছমাস সে একাই ছিল। কিছুটা গুছিয়ে নিয়ে মা আর লিসাকে নিয়ে যায় ওখানে।

বছরে একবার দুর্গা পূজার সময় বাড়ি আসে। ঈদের উৎসব ওরা ওখানেই পালন করে। একই বাড়িতে দুর্গাপূজা, লক্ষীপূজা, সরস্বতী পূজা যেমন হয় ঠিক তেমনই ঈদ, মহরম, সবেবরাত এইসব ধর্মীয় উৎসবও পালন করা হয়। সম্প্রীতির পিঠস্থান যেন এই বাড়ি। কামিনী দেবী তুরীনকে বলে,‘‘ দেখ আমরা যেমন ছোটো থেকে হিন্দুদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে এসেছি ঠিক তেমনি লিসাও মুসলিম আচার অনুষ্ঠান পালন করে এসেছে। ও যদি আমাদের সব কিছু নিজের মতো করে মানিয়ে নিতে পারে তাহলে আমাদের ও পরিবর্তন হওয়া দরকার। তুরীন মেনে নেয় মায়ের কথা। লিসা যেমন মেহেন্দি করতে পারে ঠিক তেমনই আলপনা দিতেও ওস্তাদ। ও যখন লালপেড়ে সাদা শাড়ি পরে ধূপ হাতে ঠাকুর ঘরে যায় দেখে মনে হয় সাক্ষাৎ লক্ষী প্রতিমা। সন্ধ্যায় শাঁখের শব্দে বেজে ওঠে যেন আজানের ধ্বনি। তখন মনে হয় ঈশ্বর আল্লাহ যেন একই আসনে সহাবস্থান।

সেবার দুর্গাপূজার সময় তুরীনের গাড়ির সামনে হঠাৎ এক বুড়িমা এসে পড়ে। তুরীন সঙ্গে সঙ্গে তুলে হাসপাতাল নিয়ে যায়। বুড়িমা বলে তাকে দেখার কেউ নেই। ডাক্তারবাবুরা পরীক্ষার পর বলেন উনি দীর্ঘ দিন ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। এই মুহূর্তে তার ব্লাড লাগবে। কিন্তু তার রেয়ার ব্লাডগ্রুপ। এই গ্রুপের রক্ত কোথাও পাওয়া গেলো না। শেষ পর্যন্ত তুরীনের গ্রুপের সাথে মিলল। তুরীন ব্লাড দেওয়ার পর কিছুটা সুস্থও হলো। কিন্তু ডাক্তার বাবু বললেন আর বেশি দিন নয়। একদিন মা কে নিয়ে হাসপাতাল গেলো তুরীন। কামিনী দেবী কে দেখে চমকে উঠলেন সেই বুড়িমা রোজিনা বিবি। কামিনী দেবীর হাতটা ধরে কিছুক্ষণ কাঁদলেন। বললেন আপনার ছেলে খুব ভালো। এ জন্মে আমার আর পুত্র সেবার সৌভাগ্য হলো না। তবে আমি সুখী জানেন, শেষে এই ছেলের সেবা তো পেলাম। আপনার ছেলে তো আমার ছেলের মতোই কাজ করেছে। ডাক্তার দেখিয়েছে রক্ত দিয়েছে। এবার আল্লাহর কাছে বেহেস্ত একটু জায়গা পেলেই বাঁচি। কামিনী দেবী বললেন, ক্ষ্মএ রকম কেন বলছেন, ও তো মানুষের ধর্ম পালন করেছে মাত্র। এই শিক্ষাই তো ওকে ছোটো থেকে দিয়েছি। আর আপনি ঠিক ভালো হয়ে যাবেন। ”

তুরীন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে দ্রুত ঘরে ঢুকে বলে, ‘‘কি বুড়িমা, ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে এলাম। ভালো হয়ে যাবে চিন্তা কোরো না। আজ ওষুধ পাল্টে দেবে। চলো মা,একবার বাজার থেকে ঘুরে বাড়ি যাব।

রোজিনা বিবি ইশারা করে তুরীনকে কাছে আসতে বলে। কাঁপা কাঁপা হাতে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, ‘‘তুমি ভালো থেকো বাবা, তোমার মায়ের খেয়াল রেখো। তুমি অনেক ভাগ্য করে এমন মা পেয়েছো। তোমার মতো যদি আমার একটা ছেলে থাকত -” বলতে বলতে চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। তুরীন বলল, ‘‘ ভাবছ কেনো বুড়িমা, আমি তো রয়েছি তোমার ছেলের মতোই। এবার ঘুমাও দেখি চুপটি করে, কাল আবার আসব।” এই বলে কামিনী দেবী কে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

কামিনী দেবী বাজারে গিয়ে মাদার সাপ্লিমেন্টারী কিছু খাবার দাবার কেনেন। কৌতুহল বশে তুরীন জিজ্ঞেস করে,ক্ষ্ম কি হবে এগুলো কিনছো কেন?” মা হাসতে হাসতে বলে, ‘‘ লিসাকে জিজ্ঞেস করিস।” বাড়ি ফিরে তুরীন জিজ্ঞেস করে লিসাকে। লিসা বলে সকালে তুমি ছিলে না। মা কে নিয়ে ডাক্তার খানায় গিয়েছিলাম। ডাক্তার বাবু বলল বলে-- বলে কিছুটা থামল। তুরীন অধৈর্য হয়ে পড়ছে দেখে বলল আমি মা আর তুমি বাবা হতে চলেছো। এই শুনে তুরীন আনন্দে জড়িয়ে ধরল লিসা কে। লিসা বলল,‘‘ কি হচ্ছে ছাড়ো মা এসে পরবে। পরুক আমি আমার ছেলের মাকে একটু যত্ন আদর করছি তো কি হয়েছে!”

এদিকে ভোরে হাসপাতাল থেকে ফোন রেজিনা দেবীর অবস্থা সংকটজনক। সকাল হতেই তুরীন আর কামিনী দেবী বেরিয়ে পড়ল হাসপাতালে। গিয়ে দেখল রোজিনা দেবী আর নেই। উনি বেহেস্ত না দোজাক কোথায় গেছেন জানেন না কামিনী দেবী। ডাক্তার কামিনী দেবী কে ডেকে পাঠালেন বললেন, ‘‘ শুনুন উনি মৃত্যুর আগে একটা চিঠি লিখে আমায় দিয়ে গেছেন এবং অনুরোধ করেছেন একান্তে যেন এই চিঠি টা আপনাকে আমি দিই। তাই আপনাকে এখানে ডাকা। এই নিন সেই চিঠি,আর বাকি সই সাবুদ যা করার আমি করে দিয়েছি বডি নিয়ে যেতে পরেন। ”

কামিনী দেবী চিঠি পড়ে আবার ভাঁজ করে রেখে দিলেন ব্যাগে। হাতে ধরে থাকা রুমালে চোখের বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে আসা জল মুছলেন সন্তর্পণে। তারপর তুরীনকে ডেকে বডি বের করে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন। মুসলিম প্রথা মেনে সব পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম করান তুরীন কে দিয়েই। তারপর একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। আবার ফিরে চলেন ব্যাঙ্গালোরে।

এদিকে লিসার শরীরে বেড়ে ওঠা পুতুলটা একদিন সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে গেলো কামিনী দেবীর। তুরীনের ও প্রোমোশন হয়েছে। ভাড়া বাড়ি ছেড়ে একটা সুন্দর ফ্লাট নিয়েছে তুরীন। ওরা ওদের মতোই ছেলের নাম রেখেছে শ্রী রফিকুল গোস্বামী। দুই ধর্মের সমান মর্যাদা দিয়ে রাখা হয়েছে এই নাম। কামিনী দেবী প্রায়ই বলতেন বাড়িতে, তৎকালীন যুগে কাজী নজরুল ইসলাম তার এক পুত্রের নাম রেখে ছিলেন কৃষ্ণ মহম্মদ, যা অভাবনীয়। আজ তাকে আর একবার সম্মান জানালাম।

আজ এতো আনন্দের মাঝেও কামিনী দেবীর খারাপ লাগে লিসার জন্য। প্রায় পাঁচ বছর হতে চলল লিসার বাবা মায়ের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। একাকী লিসার চোখের জল চোখ এড়ায়নি কামিনী দেবীর। কেবল ভাবে আমার মৃত্যুর আগে যদি কোনোভাবে ওদের মিল ঘটিয়ে দিতে পারি তাহলে শান্তিতে মরতে পারব। তিনি ভাবেন যে ধর্ম সম্পর্ক ছেদ করতে শেখায় সেই ধর্ম মানার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। সব ধর্মের মূল কথা যদি ভালোবাসা হয় তাহলে এতো হিংসা বিবাদ কিসের জন্য।

যাক অনেক কষ্টে লিসার বাড়ির পোস্টাল এড্রেস যোগাড় করেছেন, লিসাকে না জানিয়েই। তারপর সুদীর্ঘ চিঠি লেখেন বেয়াই বেয়ান সম্বোধ করে। তার আচরণে কোনো ত্রুটি থাকলে ক্ষমা করার কথাও লেখেন। সঙ্গে দাদু ভাই রফির একটা ছবিও পাঠান। নীচে নিজের ফোন নম্বরও দেন।

সেই চিঠি পড়ার পর করিম সাহেব ও আমিনা বিবি চোখের জল ধরে রাখতে পারে না। ভিজে যায় চিঠির পাতা। কামিনী দেবীর প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয় চিত্ত। ফোন করে কামিনী দেবী কে ক্ষমা চেয়ে নেয় তারা বারবার। বলে, ক্ষ্ম আল্লাহর কাছে মাথা নত করেছি কতবার। আজ মনে হয় সত্যি মানুষের মাঝে ঈশ্বর আল্লাহ আছেন। তাই আপনাকে প্রণাম করার ইচ্ছে রইল।

তারপর প্রায়ই আমিনা বিবির সঙ্গে কামিনী দেবীর কথা হয়। কিন্তু লজ্জায় মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারে না তার আম্মু। করিম বাবু একদিন থাকতে না পেরে লিসার ফোন নাম্বারে ফোন করে।কিন্তু কোনো কথা বলতে পারে না। শুধু দুচোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে ভিজিয়ে দেয় সাদা শ্মশ্রু।এভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর একদিন আমিনা বিবির সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হচ্ছে কামিনী দেবীর। দাদু ভাই রফিকের দুষ্টমি নিয়ে হাসি তামাশা হচ্ছে দুজনের মধ্যে। এমন সময় লিসা এসে হাজির বলল, ক্ষ্ম কার সঙ্গে এতো কথা হচ্ছে গো!ক্ষ্ম কামিনী দেবী যেন এই দিনটার অপেক্ষায় ছিলেন। বললেন, ক্ষ্মনে কথা বল দেখ কার সঙ্গে কথা বলছি।" এই বলে ফোন টা লিসার হাতে দিলেন।

প্রথমেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে আমিনা। লিসা বলতে থাকে " কে আপনি? কাঁদছেন কেনো? কি হয়েছে আপনার?" তখন কান্না ভেজা গলায় ও প্রান্ত থেকে ভেসে আসে চেনা কণ্ঠস্বর, " আমি তোর আম্মু লিসা, ক্ষমা করে দে মা। লিসার শরীরে তখন যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে যায়। "

লিসা বলে, " না তোমরা ক্ষমার অযোগ্য। আমি তোমাদের কাছে মৃত। " বলে ফোনটা কেটে দেয়। পরিবেশে বইতে থাকে যেন তপ্ত লু। হয়তো ঝড় উঠবে।পরিবেশ একটু ঠান্ডা হওয়ার পর সে দিন রাতে লিসা আর তুরীনের কাছে কামিনী দেবী বলেন কি ভাবে তার বেয়াই বেয়ানের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। তারপর লিসা কে বোঝায়, " হ্যাঁ রে মা কেউ যদি ভুল করে তাকে কি ক্ষমা করা যায় না! আর ক্ষমাই তো পরম ধর্ম তাই তো যীশুখ্রীষ্ট, গৌড় নিতাই আজও স্মরণীয়। "

"ওরা মাহাপরুষ মা, আমরা তা নই। "

" হুম, মহাপুরুষরাই তো পথ তৈরী করেন। আর আমরা সেই পথ ধরেই হেঁটে যাই। আর যদি না যাই তাহলেই তো পৃথিবী কুৎসিত। দোহাই মা আমার, ভুল বুঝিস না। ওরা তো তোরই আম্মু আব্বা তুই একমাত্র সন্তান। ওদেরও হয়তো অনেক আশা স্বপ্ন ছিল। সে গুলো ভেঙে যাওয়ার যন্ত্রণা থেকেই হয়তো ওনারা এমন আচরন করেছিলেন। কিন্তু আমি বেশ কয়েক দিন কথা বলে বুঝতে পারছি, আজ ওনারা একদম অন্য মানুষ, খুব অনুতপ্ত। আর তোর আম্মু আব্বার সঙ্গে মিল করতে না পারলে আমি যে শান্তিতে মরতেও পারব না। "

" তুমি এমন করে মরার কথা আর বলবে না বলো, বলে কামিনী দেবী কে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে লিসা।

" আমি ফোন নম্বর দেবো, কাল আম্মু আব্বার সঙ্গে একবার কথা বলিস। "

" বেশ তাই হবে মা।"

এদিকে ছোট্ট রফিক সাহেব খেলার সাথী না পেয়ে আদো আদো গলায় বলতে শুরু করেছে," তোমাদেত সবাত সাথে আদি, কেউ আমাদ সাথে খেলছো না। " এই বলে দুই বগলে হাতদুটো ভরে মুখ ঘুরে স্বামী বিবেকানন্দের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল। কামিনী দেবী সঙ্গে

সঙ্গে বলল, '' চলো চলো দাদু ভাই আমাদের খেলার দেরি হয়ে গেলো।" এইভাবে পেরিয়ে গেলো আরও একটা দিন।

তারপর দিন লিসা ফোন করল তার তার আম্মু কে। একপ্রস্ত কান্নাকাটির পর সম্পর্কের উষ্ণ বাতাস গলতে শুরু করল বুকের উপর চেপে থাকা দুঃখ কষ্টের বরফের মতো শীতল কঠিন পাথরটা। আব্বার সাথে কথা হলো অনেকক্ষণ। ধীরে ধীরে স্বভাবিক হয়ে গেলো সম্পর্কটা। তাই এবারের ঈদ আর ব্যাঙ্গালোর হচ্ছে না, হবে মেটিয়াব্রুজে লিসার বাপের বাড়িতে।

সেই মতো গোছগাছও সম্পন্ন হলো। ঈদের আগের দিন ফ্লাইটে দমদম। সেখানেই গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন করিম বাবু। কামিনী দেবীর হাত ধরে রফিককে বের হতে দেখেই কোলে তুলে নিলেন করিম বাবু। তারপর সোজা বাড়ি। আজ পাঁচ বছর পর বাড়িটা যেন প্রাণ ফিরে পেলো। ঝলমল করে উঠছে বাড়িটা। লিসার পোষা ছোট্ট কুকুরটাও বড় হয়ে গেছে। লিসাকে কাছে পেয়ে যেন তার কত জমানো কথা বলতে লাগলো। চেটেচেটে কত আদর করল। সেদিন খাবার শেষে সবাই যখন হাসি ঠাট্টায় মেতে উঠেছে তখন আমিনা বিবি বলেন,ক্ষ্মা এই ধর্মীয় গোঁড়ামি বাবা মেয়ের মধ্যে বিভেদ তৈরী করেছিল, অথচ এখন দেখো কত আনন্দে আছি সবাই। সত্যি বেয়ান আপনি মানুষ নন দেবী। "

''না না, একি বলছেন এগুলো সব মানুষের ধর্ম। শুধু মাঝে মাঝে আমরা ভুলে যাই এই যা। "

হাসতে হাসতে করিম বাবু বলেন, ক্ষ্মা তবে যাই বলুন বেয়ান আমরা কিন্তু স্বধর্মেই বিয়ে দিয়েছি। ক্ষ্মা

লিসা বলল, '' তার মানে! তুরীন তো হিন্দু ব্রাহ্মণ।"

এবার তুরীন গম্ভীর মুখে বলতে শুরু করে, '' না লিসা, আব্বা যা বলছেন ঠিকই বলছেন।"

'' তার মানে, তোমরা ব্রাহ্মণ নও!"

'' হ্যাঁ, আমরা ব্রাহ্মণ। কিন্তু জন্মগত ভাবে আমি না। কি তাই তো মা!" কামিনী দেবীর দিকে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তুরীন।

কামিনী দেবী তো অবাক, তিনি তো কোনো দিন কিছুই বলেননি তুরীন কে। তবে কি বেয়াই....

'' হ্যাঁ মা, তুমি আমায় কোনোদিন বলোনি বুঝতেও দাওনি কোনোদিন যে আমি তেমার গর্ভজাত নয়। সে দিন হাসপাতালে তুমি তোমার ব্যাগের মধ্যে রাখা ডেথ সার্টিফিকেট টা আনতে বলেছিলে আমাকে মনে পড়ে! ওখানে একটা চিঠি ছিল। তখন আমি ওই চিঠি পড়ি। যেটা আমার জন্মদাত্রী মায়ের লেখা। তার ফটোকপি করে নিয়। তারপর সব মিলিয়ে মিলিয়ে দেখি, ওনার সব কথাই ঠিক। হাসপাতাল থেকে নিবেদিতা ট্রাস্ট যেখান থেকে তুমি আমায় নিয়ে এসেছো। উনি চিঠি তে আরো লিখেছেন অভাবের তাড়নায় উনি আমাকে হাসপাতালে ফেলে রেখে চলে যান। তারপর উনি নিয়মিত খোঁজ রাখতেন তুমি আমাকে নিয়ে এসে মানুষ করছো। ব্যাঙ্গালোর চলে যাওয়ার পর উনি আর খোঁজ পাননি আমাদের।

সেদিন আমি খুব কেঁদে ছিলাম জানো মা,কবরে মাটি দিয়ে আসার পর। তুমি জেনে-বুঝেই আমার জন্মদাত্রী মায়ের সব পারলৌকিক ক্রিয়া আমায় দিয়ে করিয়েছিলে, কিন্তু আমায় বলো নি। তাই আমিও তেমায় কিছু বলিনি। রাগ হয়েছিল তোমার উপর। পরে বুঝলাম জন্মদিলেই তো মা হওয়া যায় না। ঈশ্বর, আল্লাহ যাই বলো না কেনো একজনের নাড়ি ছেঁড়ার পর অন্যের নাড়িতে জুড়ে দিয়েছিল আমাকে, সুন্দর পৃথিবীটা উপভোগ করার জন্য। তাই আজ তোমার জন্য গর্ববোধ করি মা। আমার এমন একজন মা আছে যে সবাই কে মায়ের ধর্ম শেখায়। তুমিই আদর্শ মা যে সব ধর্মের উর্ধ্বে।

এসব শুনে অবাক লিসা। তারপর করিম বাবু কামিনী দেবীর দেওয়া চিঠির সাথে রোজিনা বিবির চিঠির জেরক্স দেখিয়ে বলেন, ক্ষ্মাআমিও এই চিঠি থেকে সব জানতে পারি বাবা। " আমিনা বিবি সব শুনে গলায় বস্ত্র দিয়ে প্রণাম করে কামিনী দেবী কে। কামিনী দেবীও বুকে জড়িয়ে ধরেন আমিনা বিবি কে।

ওদিকে রফিকুল ফুলবাবু সেজে, পাঞ্জাবি পরে টুপি মাথায় তৈরি হয়ে গেছে। কাল দেখা গেছে খুশির চাঁদ। শুরু হয়ে গেছে ঈদ। ঈদ মোবারক।

ডাক পাখির মাংস !

অভিজিৎ রানা

বসন্তের পড়ন্ত বিকেলে আমার গাঁয়ের ছোট নদীর সবচেয়ে বড় বাঁকে, সবুজ ঘাসের উপর গা এলিয়ে, আকাশের এক কোণে ঢোলে পড়া সূর্যের পানে চেয়ে মন উদাসী হয়ে উঠল। অরুণাভ যেন পরশ-পাথর ছুঁইয়ে সাদা- সাদা পেঁজা মেঘগুলিকে সোনালী করে তুলছে। রবি ঠাকুরের,ক্ষ্মমন মোর মেঘের সঙ্গী...ক্ষ্ম,গান গুনগুনিয়ে তুলল আমার ঠোঁটকে....

হঠাৎ পাশের বেনাবোনের ঝোঁপটা খসখস করে উঠলো। কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখলাম, সাপটাপ নয়তো! ওখানে যে রাজবোড়া, চন্দ্রবোড়া, গোখরো কেউটের অভাব নেই! দাঁড়িয়ে পড়লাম, না-না।বেনাঝাড় না,তারই অনতিদূরে বেগুন খেতের বেড়াজালটা ঘনঘন নড়ছে! সাবধানের মার নেই, অগত্যা শক্ত দেখে একটি কলমীডাল ভেঙে নিয়ে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, বেড়ার জালে আটকে একটি ডাকপাখী, বেশ বড়সড় !

গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গিয়ে, জাল থেকে ছাড়িয়ে ডানা দুটি বজ্রমুষ্টিতে ধরে বাড়ি ফেরার উদ্যোগ করলাম। পায়ের কাদা ধোওয়ার জন্য নদীর দিকে এগিয়ে যেতেযেতে ভাবলাম, -আমার বহু দিনের শখ ডাকপাখীর মাংস খাবো। অনেকের মুখেই শুনেছি, খুবই সুস্বাদু! মনের মধ্যে একটা অদম্য জেদ ছোটবেলা থেকেই ছিল, কাউকে চেয়ে না নিজে হাতে ডাকপাখী ধরেই তার মাংস খাবো। বহুবার ঢিল ছুঁড়েছি কখনো বা একটুর জন্য ফসকেছে.....অবশেষে সেই সৌভাগ্য আজ আমার হয়েছে... !

নদীর বাঁকা পাড়ের যে জায়গায় বেলে অংশ পাঁক নেই, এক গোড়ালি জলে পা ধুতে যাবো- ঠিক তার দশ বারো হাত দূরের কলমীলতার ঝোঁপ থেকে চিঁহি- চিঁহি ডাক শুনতে পেলাম। বুঝতে অসুবিধা হল না, সে ডাক ছানা ডাকপাখীদের সমবেত চিৎকার.....

অনুভব করলাম মা-হারা ছানাদের অসহায় চিৎকার....''মা..... মা.... মাগো!'' নিমেষের মধ্যে প্রলুব্ধ মন ছ্যাঁৎ করে উঠলো, - এ আমি কী করতে যাচ্ছি! .....জালবদ্ধ যে পাখিটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে তার সুস্বাদু মাংস খাবো ভাবছিলাম, তাকে এক আঁচলা জল পান করালাম..... ভাগ্যের কী বিচিত্র পরিহাস!

এখন সে পরিহাসকে উপেক্ষা করে আনন্দচিত্তে ওকে ওর বাছাদের মাঝে ফিরিয়ে দিয়ে একরাশ সুস্বাদু সুখানুভূতি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম.....

With Best Compliments from

GANGESHNAGAR

S.K.U. S LTD

GANGESHNAGAR
SAHABAZAR
HOOGHLY–712402 SWBV
MOBILE- 7585842877

With Best Compliments from

SWAMI VIVEKANANDA ACADEMY

AFFILLITED TO CISCE NEW DELHI–(WB-435)

BELMURI– HOOGHLY -712302

MOBILE- 9434126245/9382853087

মাস্টার মশাই

ড. শমিতা ভট্টাচার্য

যেতে হবে সেই দুই কিলোমিটার দূর , রাস্তায় রয়েছে ঘন জঙ্গল , অন্ধকার হলে মুশকিল।আর তারপর রয়েছে আরো ভয়ানক জায়গা , চা বাগান,আর তারই পাশে রমেনের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।রমেন উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের একমাত্র বিজ্ঞান শিক্ষক।

মহা মুশকিল গত আধ ঘণ্টা ধরে তো কান্না শেষই হচ্ছে না। আজ রমেনের বাঁশি বিয়ে, কন্যা যাত্রার সময় ।বউ কাদতে কাদতে শেষ।

এত যদি দুঃখ , বিয়ের করার কি দরকার ছিল? এবার টেনশন হচ্ছে রমেনের , অনেক কষ্ট করে গ্রামের শশুরবাড়ির পেছন দিকে একটা গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়ালো। চারদিকে দেখলো কেউ দেখছে না তো? তারপর ধীরে ধীরে পাঞ্জাবির পকেট থেকে এনে একটি সিগারেট জ্বালালো।

সুখটান দিতেও সুখ নেই ,কেউ দেখে ফেললে উপায় নেই।শিক্ষক হয়ে ধূমপান!!

ধুর ,কেন যে এই পেশায় এলো , ২৮ বছরে কোনো সুন্দরীর দিকে প্রাণভরে দেখা যাবে না। যুবতী মেয়েরা ধুমধাম প্রণাম করছে ভক্তি শ্রদ্ধায়।

গ্রামের ছেলেগুলো আরো বাদর।যদি কোনো উল্টাপাল্টা দেখে ফেলে ,সঙ্গে সঙ্গে ছড়া বানিয়ে ছড়িয়ে দেবে পুরো অঞ্চলে।

নকল করার সময় যে ছাত্রগুলিকে ধরে উত্তম মধ্যম দিয়েছে , ওদের ভয়ে স্কুলেই জানায়নি বিয়ে করছে ।দুই একজন ছাড়া কেউ জানে না।

আজ বউ নিয়ে ভালোয় ভালোয় বাড়ি পৌঁছাতে পারলে তবে কাল স্কুলের সব শিক্ষক শিক্ষিকাদের নেমতন্ন করতে হবে।

ভাবতে ভাবতে সিগারেট শেষ।ধুর কান্না তো এখনো চলছে। রমেন গিয়ে বরকর্তা ওর বড় মামাকে বললো আর দেরি হলে মুশকিল।যাইহোক প্রায় দলা করে ওর বউকে ওর পাশে বসিয়ে দিল ওর বাড়ির লোক।ওই পাশে শালীকা বসে আছে , হাতে চামচ ,একটু পর পর বউয়ের দাত লেগে যাচ্ছে , চামচ দিয়ে মুখ খোলে।

রমেন ভাবে কাল রাতে তো দিব্যি গল্প করলো ,আর আজ দেখে মনে হচ্ছে যেন গভীর জঙ্গলে বাঘের মুখে ফেলে দিয়েছেন ওকে, আর কারোর সাথে দেখা হবে না।

গাড়ি দ্রুত গতিতে চলছে তবু রমেনের মনে হচ্ছে আরো দ্রুত হলে ভালো,স্কুলের এরিয়া পার করলে শান্তি।

জঙ্গল পেরিয়ে প্রায় স্কুলের সামনে যেতেই শালীকা চিৎকার করে উঠলো দিদি অজ্ঞান হয়ে গেছে।জল লাগবে , একটু জলের ব্যবস্থা করুন।রমেন দেখলো ঠিকই তো এ যে ঢলে পড়েছে ওর কাঁধে। গাড়ি থামিয়ে বড় মামা আর ড্রাইভার গেল জল আনতে।

জড়িয়ে ধরেছে রমেন বউকে। কোথায় সাজগোজ সব পন্ড কাদতে কাদতে ,সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু এসে পড়েছে ওর বুকে রাখা সেই মুখের উপর।লাল বেনারসি আর উর্নার মধ্যে ছোট্ট মুখখানি এত সুন্দর !! গালের মধ্যে আলতো করে ধরে মৃদু স্বরে ডাকলো মিতু মিতু,

চোখ খুললো বউ,পাশে ওর বোন মুখ টিপে হাসছে। আসলে বউয়ের নাম মিতালী , রমেন ভেবে রেখেছিল মিতু ডাকবে ওকে। মানে নিজেদের মধ্যে। কাউকে বলবে না।মাস্টার মশাইদের আবার আহ্লাদ দেখাতে নেই প্রকাশ্যে।কিন্তু হটাৎ কি যে হলো ।ধুর।

এমন সময় মামা জল নিয়ে এলেন।রমেন এখনও জড়িয়ে ধরে আছে বউকে, বউ আর মরা কান্না করছে না।একটু জল নিয়ে বউয়ের কপাল মুখ মুছে দেবে ভেবে গালে হাত দিয়েছে ,এমন সময় দেখে এক ছাত্রের মুখ ওদের দুইজনের মধ্যে। বাতাস আসবে বলে গাড়ির দরজা খুলে রেখেছিল। সেই সুযোগে ছেলেটি মুখ

বাড়িয়ে বোকার মত বলে নমস্কার স্যার , আতকে উঠেছে রমেন। তারপর মুখ সরিয়ে বলে কেমন আছেন? ভালো তো।

রমেনের মনে পড়লো নকল করার জন্য এই দুই তিনদিন আগে পরীক্ষার হল থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করেছে ছেলেটিকে।খুব অনুরোধ করছিল ক্ষমা করার জন্য।রমেন মানেনি।

রমেন বললো সর ,দরজা লাগাবো।ছেলেটি চেয়েই আছে।

শালী হাসছে মুখ টিপে।মাস্টার মশাইয়ের নাজেহাল অবস্থা দেখে নতুন বউয়ের মুখেও মৃদু হাসি।

শিক্ষাগুরু

পার্থসারথি মহাপাত্র

জাতীয় শিক্ষক পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার পর এটাই অবনীবাবুর প্রথম শিক্ষক দিবস। প্রত্যন্ত গ্রামে শ্যামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তিনি। যাওয়া-আসার অসুবিধার জন্য একটা কার নিয়েছেন। আগে জুলফন চাচা নামে একজন ড্রাইভার ছিল। এখন নিজেই ড্রাইভ করেন।

আজ সকাল সকাল নিজেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, কিন্তু একি দোরাস্তায় এসে ডান দিকের স্কুলের রাস্তা ছেড়ে উনি বাম দিকের রাস্তা ধরে সোজা রসুলডি গ্রামে পৌঁছে গেলেন। ঘরের সামনে গাড়ি দাঁড়াতে দেখে একটা যুবক দৌড়ে এসে বলল,' কি হল স্যার হঠাৎ আপনি চলে এলেন? ফোন করে দিতেন আমরাই চলে আসতাম।'

-'না। এই কাজে আমার আসাটাই দরকার। বাবা কোথায়?'

- 'ভিতরে শুয়ে আছে। আসুন ভিতরে আসুন।'

ভিতরে ঢুকে অবনীবাবু জুলফন মিঞার হাতে দুটো প্যাকেট ধরিয়ে করজোড়ে বললেন,' চাচা আজ শিক্ষক দিবস সমস্ত শিক্ষকদের সম্মান জানানোর দিন। গাড়ি চালানোর কাজে তুমিই আমার শিক্ষা গুরু। তাই আজ আমিই চলে এলাম।'

শারদীয়া ও দীপাবলীর প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই —

পাঁচড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

(জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিশুদ্ধ পানীয় জল ও প্রতিটি গৃহহীন পরিবারের জন্য বাসস্থানের ও বিজ্ঞান সম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। দুয়ারে সরকার ও লক্ষ্মীর ভান্ডার কর্মসূচী বাস্তবায়নে এই গ্রাম পঞ্চায়েত অঙ্গীকারবদ্ধ।

১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে একাধিকবার প্রথম স্থান অধিকার করায় আমরা গর্বিত

প্রধান - বিকাশ পাকড়ে
উপ প্রধান - সাবিত্রী টুডু

শারদীয়া ও দীপাবলীর প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই —

গুড়বাড়ী ১ গ্রাম পঞ্চায়েত

(ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

মানবিক পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে সকলের সার্বিক উন্নতি সাধনই আমাদের লক্ষ্য।
'কন্যাশ্রী'র সাফল্যে উদ্ভাসিত আমরা । নির্মল পঞ্চায়েত ও পানীয় জলের নিরাপদ সুরক্ষা প্রদান আমাদের উদ্দেশ্য।
'শিক্ষাশ্রী', 'রূপশ্রী' ও 'মানবিক' প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়তা সুনিশ্চিত করা আমাদের একান্ত কাম্য।
'কৃষক বন্ধু' ও 'খাদ্য সাথী' প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলিকে স্বনির্ভরতা প্রদান আমাদের লক্ষ্য।

দেশের মধ্যে বাংলা একাধিকবার প্রথম স্থান অধিকার করায় ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের সাফল্যে আমরা গর্বিত

প্রধান - অসীমা ধাড়া
উপ প্রধান - সুভাষ টুডু

ঋণ

রাফিয়া সুলতানা

রিটায়ার করার পর থেকে, পাড়ার অন্যান্য প্রবীণ মানুষ গুলোই এখন প্রবাল বাবুর সঙ্গী। রোজ মর্নিংওয়াক করতে গিয়ে অনেকটা সময় কাটে তাঁদের সঙ্গে, সুখ দুঃখের গল্প ক'রে। চাকরি জীবনের গল্প, সংসারের গল্প, সন্তানদের মানুষ করার গল্প, জীবনের নানান সাফল্য ব্যর্থতা, ওঠা পড়ার নানান কাহিনী। সময়টা বেশ ভালোই কাটে তাদের। বেশ কয়েক বছর হলো,গৃহিণী সুমিতাদেবীর মারা যাওয়া। তারপর থেকে সংসারে তিনি একেবারেই যেন একা হয়ে গেছেন। ছেলেমেয়ে থাকতেও নেই। সবাই আপন আপন সংসার, জীবিকা নিয়ে ব্যস্ত। মেয়েটা তো শ্বশুরবাড়ি থেকে আসার সময়ই পায় না। স্বামী অফিসের গুরু দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার। ছুটিছাটা কম, তার ওপর ছেলের স্কুলের পড়াশুনা, টিউশনি, এসব তো লেগেই আছে। তাই বাপেরবাড়ি আসা হয় না তেমন। এলেও, দু'একদিন থেকেই চলে যায়। ছেলে তো সেই সকালে বেরিয়ে রাত্রে বাড়ি ফেরে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সে। শুধু রাত্রে খাবার টেবিলে দেখা হয়। বৌমা স্কুলের শিক্ষিকা। সেও খুব ব্যস্ত। নাতী অনেকটা বড় হয়ে গেছে। সেও দাদুকে সময় দিতে পারেনা, পড়াশুনার চাপে। যেটুকু সময় বাড়িতে থাকে, টিভি, কম্পিউটার আর মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকে। তাই প্রবালবাবু বড্ড একা। বেশ কয়েকদিন যাবৎ চোখটাও ভোগাচ্ছে। দৃষ্টিশক্তি একেবারে কমে গেছে। একটু যে খবরের কাগজ পড়বেন, সে উপায় ও নেই। ছোটলেখা তো একদমই পড়তে পারেন না। সবকিছুই, কেমন যেন ঝাপসা দেখায়। ছেলে শৈবালকে অনেকবার বলেছেন, চোখটা একবার আইস্পেশালিষ্টকে দেখানোর ব্যাপারে। কিন্তু ঐ যে বললাম, তার মরবারও ফুরসৎ নেই। সারাদিন শুধু অফিস আর অফিস। অগত্যা ভুগতেই হচ্ছে তাঁকে।বন্ধুদের মাঝে প্রায় দুঃখ করেন, সেই নিয়ে।

একদিন হঠাৎ ফোন করে জানালেন প্রবালবাবু শৈবালকে, তিনি দুদিনের জন্য একটু বেরোচ্ছেন বন্ধু বিপিনবাবুর সঙ্গে। সে যেন চিন্তা না করে। বাবা প্রায় বন্ধুদের সঙ্গে এক আধদিনের জন্য এখানে সেখানে ঘুরতে যান। এর আগেও গিয়েছেন, দীঘা, পুরী, দেওঘর। তীর্থও করা হয়, আবার বেড়ানোও হয়। সত্যি তো, এ বয়সে যদি বন্ধুদের সাথে একটু ঘোরাঘুরি না করবেন তো সময় কাটবে কিভাবে? তাই শৈবাল খুব একটা কিছু মনে করলো না ফোনটা পেয়ে। এটিএম কার্ড বাবার কাছেতেই থাকে। তিনি ইচ্ছেমতো খরচ করেন পেনশনের টাকা।

সেইযে সেদিন ফোন করেছিলেন ছেলে শৈবালকে, তারপর থেকে আর কোন ফোনই আসেনি প্রবালবাবুর। এদিকে, সেই দুতিন দিন পার হয়ে, আরো গোটা কয়েকদিন পার হয়ে গেলো, কিন্তু তাঁর আর কোনো খবরই নেই। বড়ো দুর্ভাবনায় পড়লো শৈবাল। বাবাকে ফোন করলেই বলে সুইচ অফ। এদিকে, বিপিনবাবুর ফোন নম্বর আবার জানা নেই শৈবালের। বিপিনবাবু, অকৃতদার হাওয়ায়, তাঁর বাড়ীতেও এমন কেউ নেই, যার কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে তাঁর সংবাদ। বাধ্য হয়ে শৈবাল থানায় একটা মিসিং ডায়েরী করলো, বাবার। কিন্তু ক'দিন বহু চেষ্টা চরিত্র করে, সেখান থেকেও কোন সদুত্তর পাওয়া গেলোনা। খোঁজ নিয়ে দেখা গেলো, বাবার অ্যাকাউন্ট থেকে বেশ কিছু মোটা টাকা তোলা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। ক্রমে সবার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যেতে লাগলো, প্রবালবাবুর পরিবারের। কিছু একটা অঘটন ঘটেছে, সবাই যেন নিশ্চিত এ ব্যাপারে। দেখতে দেখতে প্রায় একমাস হয়ে গেলো, প্রবালবাবুর নিরুদ্দেশের। সবাই প্রায় সব আশা ছেড়ে দিয়েছে। সবার সন্দেহ বিপিনবাবুকে

ঘিরে। তিনিই কিছু অপকর্ম করেছেন তাহলে। অর্থ লোভ বড়ো সাংঘাতিক। সেখানে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বও হার মানে। হয়তো, প্রবালবাবুকে ভুল বুঝিয়ে, তাঁর টাকাপয়সা হাতিয়ে, তাঁকে কোন বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে, নিজেও বেপাত্তা হয়ে গেছেন তিনি।এইভেবে, সবাই যখন প্রায় হাত ধুয়ে বসে আছে, তখন হঠাৎই একটা অচেনা নম্বর থেকে ফোন এলো একদিন। ফোনটা এসেছিলো, চেন্নাই এর ক্ষ্মশঙ্কর নেত্রালয়ক্ষ্ম আই হসপিটাল থেকে। প্রবালবাবুর নাকি, বেশ কিছুদিন আগে কর্নিয়া প্রতিস্থাপন হয়েছে। তিনি আপাততঃ এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। কিন্তু সঙ্গে কেউ না থাকায়, তিনি বাড়ি ফিরতে পারছেন না। অবিলম্বে যেন তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। খবরটা শুনে সবাই যেন আকাশ থেকে পড়লো। প্রবালবাবুর সুস্থতার খবরে সবাই আশ্বস্ত হলেও, খটকা একটা রয়েই গেলো। বিপিনবাবুই তো সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রবালবাবুকে। তাহলে, তিনি এখন কোথায় গেলেন?

যাইহোক, ফ্লাইটে টিকিট কেটে পরেরদিনই শৈবাল রওনা হলো, চেন্নাই এর উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়ে সব শুনে তো সে একেবারে স্তম্ভিত। প্রবালবাবুর নাকি কর্নিয়া প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন ছিলো। তাই তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য এখানে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু প্রতিস্থাপন যোগ্য কর্নিয়ার ডোনারের অভাবে, তাঁর চিকিৎসার কিছু বিলম্ব হচ্ছিলো। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন বিপিনবাবু হৃদরোগে আক্রান্ত হন। মারা যাওয়ার আগে, কিছুক্ষণ জ্ঞান ছিলো তাঁর। তখনই, তিনি তাঁর চক্ষু দান করে যান, বন্ধুর জন্য। আর আজ তাঁর জন্যই প্রবালবাবু আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন। এইভাবে বিপিনবাবু মৃত্যুকালে রেখে যান এক বিরল বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত! অনুশোচনায় ভারাক্রান্ত হয়ে গেলো, শৈবালের মন। সত্যিইতো, বাবা তাকে অনেকবার বলা সত্ত্বেও, ছেলে হয়ে সে তার কর্তব্য পালন করতে পারেনি, অথচ একজন অশীতিপর বৃদ্ধ, রক্তের কোন সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও, শুধুমাত্র বন্ধুত্বের তাগিদে, নিজের চোখের বিনিময়ে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন আরেক বন্ধুর দৃষ্টিশক্তি। অথচ তাঁর সম্পর্কে কিইনা অমূলক খারাপ খারাপ ধারণা করছিলো তারা! বাড়ি ফিরে শ্রাদ্ধশান্তি ও যাবতীয় সমস্ত পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম সমাধার মাধ্যমে শৈবাল পরিশোধ করলো বিপিনবাবুর সেই ঋণ।

রাঃ-স্বাঃ

জয়গুরু মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

প্রোঃ - সুশান্ত কুমার নন্দী

প্রসিদ্ধ দই ও মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহক
পনির, বাটার, কোল্ড ড্রিংক্স ও
জন্মদিনের কেক পাওয়া যায়।

খানপুর (হাটতলা, চৌমাথা), হুগলী

অমৃতের উৎস সন্ধানে

জয়ন্ত বারিক

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়,পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।বিগত ৫০ বছরে জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে তার থেকেও দ্রুত গতিতে কমেছে কৃষিজমি।আগামী ৫০ বছরে বিশ্বে দেখা দিতে পারে চরম খাদ্য সংকট।অন্যদিকে বাড়ছে সভ্যতা,পাল্লাদিয়ে দূষণ, জীবন হয়েছে আরামপ্রদ- কর্ম বিমুখ। বাড়ছে ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল, হার্ট অ্যাটাকের মত রোগ। সবদিক ব্যালেন্স করে চলতে আমাদের অনেক ভাবতে হচ্ছে।যেহেতু কৃষি জমির পুনরুদ্ধার সম্ভাব নয় তাই আমাদের সাস্টেনবল ফুড প্রোডাকশনের দিকে নজর দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ধান ও গম উৎপাদনের জন্য উর্বর জমির ও প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়।এবং এইজন্য ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার বিপুল পরিমানে করতে হয়।মিলেট উৎপাদনে কম জলের প্রয়োজন হয়।পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয় না।আবার মিলেট উৎপাদনে পতিত জমি ও অকৃষি অনুর্বর জমিতে ফসল ফলানোর দিকে জোর দেওয়া হয় ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে দুটো খাবার তুলে দেবার জন্য।এই রকম একটি দানা শস্য বা খাদ্য হল মিলেট। আমরা শুরু থেকেই জেনেছি জোয়ার রাগী কে একত্রে মিলেট জাতীয় খাদ্য বলে। এই মিলেট একদিকে খাদ্যের ব্যলেন্স করে ও অন্যদিকে একপ্রকার সর্বরোগহর খাদ্যগুণ সম্পন্ন ফুডগ্রেন। চলতি কথায় এটি এক প্রকার ঘাসের দানা বা শস্য দানা। মিলেট একটি প্রোটিন, মিনারেল, উচ্চফাইবারসমৃদ্ধ খাবার।স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পর অমৃত মহোৎসবে ভারতবর্ষের তথা বিশ্বের বিজ্ঞানী, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, পুষ্টিবিদদের পাঠানো তথ্য অনুযায়ী ইউনেস্কো বা রাষ্ট্রসংঘ ভারতের প্রস্তাবনার সম্মান দিয়ে এবং বিশ্বকে আগামী সংকট থেকে বাঁচাতে এই ২০২৩ সালকে আন্তর্জাতিক ইয়ার অফ মিলেট বলে আখ্যা দিয়েছেন।এককথায় মিলেট এই শতকের অমৃত।

পদ্মশ্রী পুরষ্কার প্রাপ্ত প্রফেসর দক্ষিণ ভারতীয় বিজ্ঞানী ডক্টর খাদের ভালি যাকে ''মিলেট ম্যান অফ ইন্ডিয়া'' বলে জানি, তিনি প্রখ্যাত খাদ্য পুষ্টি বিশেষজ্ঞ অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা। দীর্ঘদিন আমেরিকায় গবেষনা করে এর উপকারিতা সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন।এই প্রসঙ্গে বলি, পৃথিবীর মধ্যে মিলেট উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করেছে ভারতবর্ষ। মিলেটের জনপ্রিয়তা ব্যবহার গুণকে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে আগেই বলেছি যে ২০২৩ সালকে '' ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ মিলেটস'' ও ভারত সরকার ইন্ডিয়ান রেলওয়ে টিকিটের পিছনে মিলেটের প্রচার চালাচ্ছে। সারা বিশ্ব তো ধান ও গমের উপর খাদ্যে নির্ভরশীল। মিলেটকে এভাবে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করলে ধান ও গমের উপর খাদ্য যোগানের চাপ অনেকটা কমবে।২০৩০ সাল পর্যন্ত স্থিতিশীল উন্নয়নের পক্ষে এই পথচলা শুরু হয়েছে। তার অন্যতম প্রথম পদক্ষেপ হল মিলেটকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার।এতে রোগেরও প্রাদুর্ভাব কমবে, সুস্থতার মাত্রা বৃদ্ধি পাবে অনেকটা। ঔষধ এর ব্যবহার কমবে লক্ষ্যণীয় ভাবে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

ভারতবর্ষে ১২ রকম প্রজাতির মিলেট পাওয়া যায়।বিজ্ঞানী পুষ্টিবিদ পদ্মশ্রী ডক্টর খাদের ভালি এর থেকে পাঁচ ধরনের মিলেট

কে শ্রীধন্য মিলেট হিসাবে অভিহিত করেছেন।এই পাঁচ ধরনের মিলেট হল কোডো মিলেট, ব্রাউন টপ মিলেট, লিটিল মিলেট, ব্রান ইয়ার্ড মিলেট, ও ফক্স টেল মিলেট। এই মিলেট গুলি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করলে ডায়াবেটিস, হার্ট অ্যাটাক, ওবেসিটি, ফ্যাটি লিভার, নার্ভের ডিসঅর্ডার,আর্থারাইটিস প্রভৃতি রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সভ্যতার আদিতে মানুষ মিলেটকে খাবার হিসেবে গ্রহন করেছিল। আজ থেকে ষাট সত্তর বছর আগে ধানের ফলন ছিল খুব কম কিন্তু খাদ্যগুন ছিল বেশি। বর্তমান জনবিস্ফোরণ ও তার খাদ্য চাহিদা ঠেকাতে উচ্চ ফলনশীল ধান ও গম ফলনের জন্য কীটনাশক , রাসায়নিক সার এর ব্যবহারে খাবারের গুনগত মান যেমন কমছে, তেমনি পালিশ করা চালের মধ্যে চালের প্রধান উপকরনটাই অনুপস্থিত। গমের মধ্যে গ্লুটেন নামক রাসায়নিক পদার্থ ডায়াবেটিসের কারণ। তাই বর্তমানে ধান ও গমকে নেগেটিভ ফুড গ্রেন ও উত্তম ফাইবার মিনারেল সমৃদ্ধ মিলেটকে পজেটিভ ফুড গ্রেন বলে গন্য করা হয়। ধান ও গমের মধ্যে ফাইবার কম থাকার জন্য এদের তৈরি ভাত বা রুটি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করলে রক্তে খুব তাড়াতাড়ি গ্লুকোজ মিশে যায়,তৈরি

হয় ডায়াবেটিক রোগী। অন্যদিকে মিলেটের মধ্যে উচ্চ ফাইবার থাকার জন্য গ্লুকোজ খুব ধীরে ধীরে রক্তে মেশে। তার জন্য ডায়াবেটিস রোগের সম্ভাবনা অনেকটা কমে যায়।

ধানের ভাতে কার্বোহাইড্রেট ৭৮ থেকে ৮০ শতাংশ। মিলেট এর ভাতে এই গড় ৬৫ শতাংশ।তাই মিলেট গ্রহণ করলে ক্যালোরি ইন্টেক কম হবে। ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকবে। মিলেটের মধ্যে নয় থেকে বার শতাংশ ফাইবার, ধানের চালে কোন ফাইবারই নেই।তাই দুবার যদি দিনে মিলেটকে খাদ্য হিসেবে করা যায় তাহলে ৭৫ শতাংশ ফাইবারের ঘাটতি মিটে যায়। বাকি ২৫ শতাংশ ফল শাকসবজি থেকে আমরা পূরন করতে পারি। মিলেটে প্রোটিন ১০ থাকে অন্যদিকে চালে ৭। মিলেটে ভিটামিন বেশি থাকে, তুলনামূলক ভাবে চালে অনেকটা কম থাকে। তাই এই স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে অমৃতযোগ তৈরি হয়েছে তাতে সরকার মনে করেছে মিলেট, রোগজরাজীর্ণ ভুবুক্ষু মানুষের কাছে অমৃত সমান। জি ২০ সম্মেলনও এ বছর হচ্ছে ভারতবর্ষে, আর এর মূল বিষয়টি হল পরিবেশ। তাই এই ঘটনা বেশ তাৎপর্যপূর্ন।

এবার আসি মিলেটের রান্নার পদ্ধতি নিয়ে। যেহেতু মিলেটের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার শক্ত বাঁধনে বাধা থাকে তাই মটর কড়াই,ছোলা কড়াই যেমন ভিজিয়ে রাখতে হয় রান্না করার ঠিক আগে, তেমনি মিলেটকেও নূন্যতম আটঘন্টা জলে দিয়ে রাখলে এবং মাটির পাত্রে রান্না করলে ও সেটিকে আরো ৬ ঘন্টা সন্ধান প্রক্রিয়ায় রেখে দিলে মিলেটের ফাইবার আলগা হয়ে যায় ও কিছু ভালো উপকারী ব্যাকটেরিয়ার জন্ম দেয়।ফলে সেটা অনেক সহজ পাচ্য হয়ে যায়। অনেকে বলবে এটা বিরাট ঝামেলার ব্যাপার। কিন্তু আমার এক বন্ধুর কথায়, যার দ্বারা আমি মিলেট সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়েছি ও জেনেছি, এই ছোটখাটো ঝামেলাটা করতে পারলে তাহলে জীবনে প্রচুর ওষুধ ও ল্যাবের বিল, হাসপাতালে উদ্বিগ্ন মুখ এগুলো থেকে মুক্তি পেতে পারি।তাই ইউনেস্কো অনেক চিন্তাভাবনা করে এই বছরকে ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ মিলেটস বলে ঘোষনা করেছে। আসুন আমরা সকলে মিলেট নামে অমৃত কে গ্রহণ করি সকলে সুস্থ থাকি বা সুস্থ থাকার চেষ্টা করি।

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই.....

আবুজহাটি ১ গ্রাম পঞ্চায়েত

(জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

- ইন্দিরা আবাসন ও গীতাঞ্জলি প্রকল্পে গৃহ অনুদান।
- MGNREGS -র গ্রামীণ মজুরদের কর্মদিবস প্রদান এবং কৃষিকাজের সুবিধার্থে চাহিদা অনুযায়ী পুকুর-ক্যানেল, খাল-বিল সংস্কার ইত্যাদি।
- "জল ধরো... জল ভরো... /কৃষি বাঁচাও... জীবন গড়ো" এর সার্থক রূপায়ণ। স্বচ্ছ গ্রাম পঞ্চায়েত গড়তে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ।
- "মিশন নির্মল বাংলা"-র লক্ষ্যে পঞ্চায়েতভুক্ত প্রত্যেক পরিবারে শৌচাগার নির্মাণ প্রকল্পে একশ শতাংশ সহায়তা প্রদান।
- সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ। ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে ধারাবাহিক আন্দোলনে শরিক।
- পঞ্চায়েতভুক্ত সকল নাগরিককে পঞ্চায়েতমুখী করণ। দুয়ারে সরকার কর্মসূচীর সফল রূপায়ণ।

১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে একাধিকবার প্রথম স্থান অধিকার করায় আমরা গর্বিত

প্রধান - রমজান শা

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই.....

মাকালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

(পোলবা দাদপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

১। নারী শিক্ষার দিশা হল কন্যাশ্রী। এটি একটি আর্থিক উৎসাহদান প্রকল্প, যা আজ সারা বিশ্বে সম্মানিত।
২। বাল্যবিবাহ রোধ করে কন্যাশ্রী।
৩। দরিদ্র মেয়েদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য করে কন্যাশ্রী।
৪। প্রতিটি পরিবারে শৌচাগার মহিলাদের নিরাপত্তার প্রতীক।
৫। আসুন শৌচাগার গড়ি, মনের সুখে ব্যবহার করি।
৬। বিলাব কেন মা বোনের মান, রাখব ধরে ঘরে নারীর সম্মান।

আমাদের অঙ্গীকার–

সর্বশিক্ষা, সর্বস্বাস্থ্য ও মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী সহ পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ, রূপায়ণ সহ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে সফল করতে সততা, নিষ্ঠা, দ্রুততা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনে আমরা দায়বদ্ধ।

প্রধান - অঞ্জন সিংহরায়
উপ প্রধান - বালিকা রায়

ডাইরির পাতায় - যদি বেঁচে যাই !

মীনা রায় বন্দ্যোপাধ্যায়

আর্থারাইটিস এক ভয়ঙ্কর ব্যামো। শরীরে ব্যথা অনুভব কখন যে কোথায় হবে অজানা। এই হাঁটু , তো সেই কোমর কিংবা হাতের কনিষ্ঠ আঙুল নয়তো বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ যন্ত্রণাতে জর্জরিত। দুহাজার দশ সাল থেকে এই ব্যথার সূত্রপাত। রক্ত পরীক্ষা আর এক্সরে করার পরে ডাক্তার বাবুর নির্দেশ ছিল কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। নিয়মিত কিছু ব্যায়াম করতে হবে।ওষুধ বিশেষ নেই।বেশি যন্ত্রণা করলে যা খেতে হবে সে যন্ত্রণা উপশমের ওষুধ শরীরের অন্যান্য যন্ত্রকে দুর্বল করবে। তাই অতিরিক্ত ব্যথা না হলে খেতে হবে না।

নিয়মিত শিবিরে গিয়ে প্রাণায়াম যোগাসন করছিলাম।করোনা কালীন প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে সমবেত প্রাণায়াম নিষিদ্ধ থাকায় বাড়িতে একা সেভাবে করা হয় নি।অথচ সেলফোন নিয়ে লেখালেখিতে ঘাড়, হাত, কোমর ব্যথা শুরু। হাঁটুর ব্যথা অগ্রাহ্য করেও কিছু অনুষ্ঠানে যাওয়া চলছিল।শেষমেশ শয্যাগত। বসে খেতেও পারছিলাম না।

শুয়ে শুয়ে ভেবেছি অনিত্য জীবন। কারো সঙ্গে যদি জ্ঞানে অজ্ঞানে কোনো অশোভন আচরণ করে থাকি, হে প্রভু একবার সুযোগ দাও ,আমি ক্ষমা চেয়ে নেবো। কৃপন স্বভাবে পথে হেঁটে চলতাম ,আর চলবো না।যেখানে যেমন প্রয়োজন-খরচ করবো।

আর একবার যদি বাঁচি , পুনরায় যোগ শিবিরে যাবো। নিজেকে সুস্থ রাখা খুব প্রয়োজন। অনেক লিখেছি, বই প্রকাশিত হয়েছে বহু,কিন্তু এই দুর্দিনে কাকে পাশে পেলাম? খাদ্য, পথ্য, গরম সেঁক দিয়ে শয্যা থেকে সুস্থ করে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে সঙ্গী সন্তান। জীবনসঙ্গী আর আত্মজ এই দু'জনকেই ভরসা করে এ যাত্রায় পুনর্জীবন ।

বর্তমানে পুস্তক নিত্যসঙ্গী। প্রচুর লিটল ম্যাগাজিন ও পুস্তক আমার সঞ্চয়ে। এখন যা হাতে পাই পড়ি।জ্ঞানের ভান্ডার সব । তখন অনুষ্ঠানে ঘুরে ঘুরে শুধু সঞ্চয় করে রেখেছি।পড়বার সময় পাই নি।সংসারের কাজ করতে করতে অনুষ্ঠানে গেছি, আর ঘরে ফিরে আবার বাকি কাজ সামলানো। নিত্যই ছুটোছুটি। লেখা আর ছুটে যাওয়া। পড়া হয় নি সত্যিই।নিজের লেখা আছে দেখেই পত্রিকা রেখেছি ঘর ভরতি করে।কেউ বা উপহার দিয়েছে, সেও পাঠের সময় হয় নি।অনুষ্ঠানে গেলে ঘরের মহিলা যেন অক্সিজেন পেতাম।লেখার ভাবনা আসতো, তখনই না লিখে পরে লিখবো বলে আর সে লেখা মনেই আসে নি।

জমা আছে রবি জীবনীর সমস্ত ভাগ। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত,রবীন্দ্র-শরৎ রচনাবলী ও বিভূতিভূষণের রচনা সমগ্র কিছু কিছু পাঠে দিন যাপনের প্রচেষ্টায়। জগতে কত সৃষ্টি সম্ভার!

আহরণ করি যে টুক পারি বাকি দিনগুলোতে।

প্রতি ইংরেজি মাসের
১৫ ও ৩০ তারিখ
প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

www.khaborsojasuji.com

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮

যাত্রা-কথা

প্রভাস পাল

শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছেন ''যাত্রায় লোকশিক্ষা হয়।'' লোকশিক্ষার বাহক যাত্রাপালা বছরের পর বছর চর্চার ফলে গ্রামবাংলায় সাড়া জাগিয়েছিল। গ্রামে পূজা, পার্বণ, উৎসব, মেলায় আবশ্যিক ছিল বাৎসরিক যাত্রানুষ্ঠান। পেশাদার যাত্রাপার্টি কলকাতা থেকে এসে যাত্রা করতো কিছুদিন আগেও। ছিল পেশাদার যাত্রাপার্টির যাত্রা শোনার হিড়িক। পেশাদার যাত্রা শিল্পীদের অনুসরণ করতো গ্রামের যুবকরা।সব মিলিয়ে যুবকরা যাত্রায় পেত বেঁচে থাকার অক্সিজেন। আগে যাত্রাপালায় স্ত্রী চরিত্রগুলি পুরুষরাই করতেন। পুরুষদের মহিলা সাজানো হত।সে জন্য মহিলা পরিচ্ছদ রাখতে হত সাজঘর মালিকদের।পরে অবশ্য সব স্ত্রী চরিত্র গুলির জন্য মহিলা শিল্পী ভাড়া করা চালু হলো।

যাত্রাপালাকার গৌড়চন্দ্র ভড় মহাশয় সামাজিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক পালা রচনা করে সারা বাংলায় সুপরিচিত হয়েছিলেন। উনি বলতেন, পালা রচনার পদ্ধতির কথা। যাত্রাপালায় করুন রস যেমন থাকবে, তেমনই থাকবে হাস্যরস। ভাঙন থাকবে আবার মিলনও থাকবে। কথা প্রসঙ্গে উনি বলেছিলেন, ''ধরুন, মঞ্চে অভিনয় চলাকালীন একটা দৃশ্যে হয়তো মিলনের সুর। দর্শক খুশি হয়ে বিড়ি ধরাচ্ছেন। ঠিক তখনই একটি চরিত্র মঞ্চে প্রবেশ করে জানালো, এই মিলন হবে না ! চমকিত দর্শকের হাতের বিড়ি হাতেই রয়ে গেল ; ধরানো হল না। সবসময়ই কি হবে, কি হবে ভাব।''

যাত্রাশিল্পটি মুখ থুপড়ে পড়ল পরবর্তীকালে কিছু যাত্রাদল মালিকের অতি লোভে। তাঁরা চটজলদি মুনাফার জন্য কঠিন পরিশ্রম করা যাত্রাশিল্পীদের পরিবর্তে সিনেমা থিয়েটার থেকে আয়েশি শিল্পীদের মনোনীত করলেন। তার সঙ্গে আলোর কারসাজি করে দর্শককে ভেলকি দেখানোর চেষ্টা করলেন। ফলে যাত্রার পদ্ধতিটি পাল্টে গেল। পালা রচনার কাহিনীর বাঁধন আলগা হল। ফলে যাত্রার 'রেট' বাড়াতে হল। যাত্রা মান হারালো। দর্শক খরচ করে প্যান্ডেলে ঢুকে যাত্রার সেই স্বাদ পেলেন না। দর্শককে ফাঁকি দিতে এসে যাত্রা ফাঁকে পড়ে গেল। যাত্রাশিল্পও ছোট হতে হতে থমকে গেল। যদিও এখন রেডিও ও টেলিভিশনে নিয়মিত যাত্রা অনুষ্ঠান হয়। রাজ্য সরকার যাত্রা উন্নয়নে যথেষ্ট সচেষ্ট। প্রতি বছর হচ্ছে যাত্রামেলাও।

যাত্রাকে স্বমহিমায় ফিরে পাওয়া অসম্ভব নয়। যাত্রাকে ভালবাসতে হবে। উপলব্ধি করতে হবে। পরিকল্পনা করে অল্প খরচে যাত্রা পরিবেশনের পথ বের করতে হবে। শিক্ষার প্রসার হওয়ার ফলে ছেলেমেয়েদের আগের মতো আড়ষ্টতা নেই। তাই স্ত্রী চরিত্রগুলি বাড়ির বা পাড়ার বা গ্রামের মেয়েদের দিয়ে পরিবেশন করতে হবে। মঞ্চ ও আলো সাধারণ হলেও অভিনয়কে হতে হবে জোরালো। অভিনয়ের সময়কাল হতে হবে অল্প। সেইমতো পালা রচনা করতে হবে। চরিত্র সংখ্যা কম করতে হবে। আপাতত, এই পদ্ধতি চললেই কিছুদিনের মধ্যে যাত্রা আবার তার স্বমহিমায় ফিরে আসবে। এ ব্যাপারে আমি আশাবাদী।

বোতাম

সুবিমল সোম

গিন্নি বাপের বাড়ি গেলে চুমকি একটু গা ঘেঁষে বসে। আমিও বাদামটা কলাটা বেশ আদর করে খাওয়াই। চুমকি একটা বাচ্চা মেয়ে হনুমান। মাস দুয়েক হলো বাড়ির আম গাছটায় বাসা বেঁধেছে।

দুপুর বেলা একা আছি ভাবলুম জামার হাতার বোতামটা বসাই। আলসের উপর জামাটা রেখে যেই সূচটা বোতামটা হাতে নিয়েছি,অমনি বোতামটা ফস্ করে নিচে পড়ে গেল । চুমকি কাছেই ছিল। তিড়িক তিড়ক করে নীচে নামলো আর বোতাম টা নিয়ে এলো। এবার সাবধানে কাজ করছি কিন্তু আবার ফসকে গেল বোতামটা । নিকুচি করেছে বোতাম বসানো! এই মিঠেরোদের সমুদ্রে কম্বলটা মাথা থেকে পা পর্যন্ত চাপা দিয়ে ঘুমের নৌকায় ভাসিয়ে দিলাম শরীরটা।

চুমকির কিচিমিচি ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি হাত মুঠো করে মাথার কাছে বসে আছে। হাত পাততেই নতুন একটা গোলাপি বোতাম আমাকে দিলো। জামাটার সঙ্গে বেশ মানিয়ে গেল।

বিকেলবেলা বাজারে গেছি দেখি বন্ধু অশোক একটা জামা নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে আসছে। বললাম, ‘‘কী হলো রে ? ’’

‘‘ আর বলিস না জামকটা রোদ্দুরে দিয়েছি, হটাৎ দেখি একটা বাচ্চা হনুমান জামা থেকে বোতামটকা কেটে নিয়ে পালালো । খানিকটা ছিড়েও গেল জামাটা।’’ আমি সঙ্গে সঙ্গে জামার হাতাটা চেপে ধরে বাড়ি। দেখি দরজার সামনে হাত মুঠো করে বসে আছে চুমকি। হাত বাড়াতেই আমার হাতে ঢেলে দিল আরো পাঁচটা নতুন বোতাম।

দুটি গাছের গল্প

ইরফান মল্লিক

দুটি গাছ। একটি খুব সুন্দর। আর একটি শুকনো মতো। সুন্দর গাছটি একদিন বললো,‘‘আমি কত সুন্দর। আর তুই তো বেরঙিন গাছ। ’’ শুকনো গাছ কিছু বললো না। একদিন অনেক পাখি উড়ে যাচ্ছিল। শুকনো এবং সুন্দর গাছ দেখলো। আর একদিন দশটি পাখি বসল। শুকনো গাছে পাঁচটি আর সুন্দর গাছে পাঁচটি। শুকনো গাছ দেখে খুশি হল। সুন্দর গাছ বললো,‘‘হুশ হুশ,সর আমার পাতা থেকে।’’ সুন্দর গাছের পাখিরা বললো,‘‘ওই দেখো শুকনো গাছে কত পাখি বসে আছে। চলো আমরা ওখানে যাই।’’ তারা চলে গেল শুকনো গাছে।অন্য দিন তারা বলে, ‘‘সুন্দর গাছে ফল হয়।আর শুকনো গাছে ফল হয় না। চলো আমরা ওই ফল গুলো খাই।’’ তারা সেই ফলগুলো খেয়ে নেয়। সুন্দর গাছে আর ফল ধরে না। আর শুকনো গাছ এবার সবুজ হয়ে ওঠে। শুকনো গাছে ফল ধরে। সুন্দর গাছ এবার বুঝলো, সুন্দর হলেও অন্যকে দুঃখ দিতে নেই।

এখানে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা বাস্তমতে আধুনিক ডিজাইনের বাড়ি ও ফ্লাট এর প্ল্যান, 3-D মডেল, এস্টিমেট, বাড়ির জন্য ব্যাংক লোন, সুপারভিশন, ল্যান্ড সার্ভে, জমির সাইট প্লান, স্কেচ ম্যাপ-কাজ করা হয়,অনলাইনে বাড়ির পারমিশন করা হয়।
Mob.- 9126158652
সুপ্রকাশ দাস (কনসালট্যান্ট সিভিল ইঞ্জিনিয়ার)
অফিস- মৌবেশিয়া, গুরাপ, হুগলি,
দশঘড়া গুরাপ রোড গুরবাড়ী ২ নম্বর পঞ্চায়েতের সন্নিকট,

ভারতবর্ষের মাটিতে চোখ রাখুন

চঞ্চল সিংহরায়

ভারত আমার ভারতবর্ষ একথাটা আমরা মনপ্রানে গ্রহণ করতে পেরেছি কি? পৃথিবী ভূপৃষ্ঠের যে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডটিকে আমরা ভারতবর্ষ বলে চিনি, যেখানে আমরা বসবাস করি, তার মাটিটাকে আমরা সর্বস্তরের মানুষ চিনতে চেয়েছি কি? আমরা চিনতে চেয়েছি বিভাজনবাদ, চিনতে চেয়েছি জাতপাত, চিনতে চাইনি মানুষকে।কেবল মনের মধ্যে বৃদ্ধি করেছি ভেদবুদ্ধিকে।তাই বিভিষিকা হয়ে দাঁড়ায় মণিপুর। লেলিহান শিখা পৌঁছে যায় হরিয়ানায়।মানুষের কাছে পৌঁছায় না ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি কথার অর্থটুকু।জীবনকে জাগ্রত করতে হৃদয়কে মানবমুখী করতে পেরেছি কি ? স্বাধীনতার পরবর্তী ৭৫ বছর ধরে শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ আমরা যাদের বলে থাকি বা বলি, বড় বড় ইমারতের মধ্যে লেখাপড়া কিছুটা হয়েছে গো, লেখাপড়া শিখেছে গো,তবে সে শিক্ষা কোন শিক্ষা?শিক্ষায় যদি হল তবে ভারতবর্ষের রাজ্যে রাজ্যে তাহলে কি করে চলছে বিভেদের উস্কানি ? জাতপাতের হিসাব নিকাশ ?দলিত দলন, আরও কত কি। শিক্ষা তো একথা বলে না।শিক্ষা তো মানুষের চিন্তা শক্তিকে বুদ্ধিদীপ্ত করে তোলে,দেশকে গড়ে তুলতে চায়,ঐক্যের বাতাবরণ তৈরি করে। সংঘবদ্ধ দেশই হল দেশের শক্তি।এই ভাবনার ব্যতিক্রমী চিন্তাই হল ঐক্যবদ্ধ দেশ নয়, বিভাজিত রাজ্য,বিছিন্ন দেশ।ভারতবর্ষ আজ ক্রমশই কি সেই বিচ্ছিন্নমুখী ভাবনায় ভাবিত ? হিংসা, প্রতিহিংসা, বীভৎসতার সঙ্গে প্রতিটি রাজ্যে ঘটে চলেছে অমানবিক দেউলিয়াপনা। ভোট হিংসাও অতি ক্ষমতায়নকে নিয়ে আসে।মনুষ্যত্বের অবমাননাই হয়ে উঠছে।সমস্ত দেশ জুড়ে যদি বিভিষিকা দেখা দেয় তাহলে একথাই বলতে পারি ক্ষুদ্রদেশক্ষুদ্র নয়,ভঙ্গুর ভারতবর্ষ আমরা চাইছি।আমাদের দয়াধর্ম নেই,অনুভূতির প্রকাশ নেই।আমরা শিকার হচ্ছি বীভৎসতার,নাগরিক সভ্যতা বিকাশের নয়।৭৫ বছরে শিক্ষায় শিক্ষিতরা বা যারা অতি শিক্ষায় শিক্ষিত, হয়তো ভারতবর্ষ নিয়ে ভাববার অবকাশ তাদের নেই।নয়তো শিক্ষা থাকলেও বিভেদবুদ্ধি থেকে বেরুতে পারছেন না।চিরন্তন মানববুদ্ধি রক্ষায় আমরা সবাই ব্যর্থ। রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের পোয়াবারো লাভের অঙ্ক বাড়াতে।'লজ্জা শরম' নাই কথাটা আজ তাই বহুল ব্যবহৃত।পায়ের কাছ থেকে ভারতবর্ষের এক মুঠো মাটি তুলে চোখ রাখলে দেখব সেই মাটিতেও নানা বৈচিত্র্য,কিন্তু তার মধ্যে তারা একসঙ্গে বেঁধে থাকে।সেই মাটিতে বসবাসকারী আমরা ভারতের নাগরিকরা একাত্ত ও গ্রথিত হতে পারি না।সবাই স্বার্থ ও সুবিধাভোগী হতে চায়।তাইতো মণিপুর, হরিয়ানা,শিখিস্থান, কামতাপুরী প্রভৃতির উত্থান। বিবেকানন্দের ভাষায় স্বপ্নের ভারত দূর অস্ত। শ্রী চৈতন্যের কাছ থেকে আজও আমরা চৈতন্যের অধিকারী নয়।

'খবর সোজাসুজি'র সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনায় -

জনৈক শুভানুধ্যায়ী

বয়ে চলো নদী

পার্থ পাল

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ঘাট থেকে অনেকেই দৃশ্যটা দেখে থাকবেন। কিছু স্থানীয় যুবক মাঝগঙ্গায় হেঁটে বেড়াচ্ছেন! এর প্রথম কারণ, গঙ্গা নদীতে জলপ্রবাহের হার কমে যাওয়া। দ্বিতীয় কারণ, পরপর দুটি সড়ক ও রেল সেতুর পিলারের বাধা। এবং সর্বশেষ কারণ, নদীতে লাগামহীন দূষণ। ঘরের কাছের এই উদাহরণ ব্যতিক্রম নয় মোটে, বরং তা বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন।

আমাদের দেশে এখন শাখা ও উপনদী মিলিয়ে মোট ১০,৩৬০ টি নদী আছে। যাদের মাধ্যমে নদী অববাহিকা অঞ্চলে বছরে মোট দুহাজার ঘন কিলোমিটার জল প্রবাহিত হয়। এমন নদীমাতৃক দেশেও নদীরা ভালো নেই। প্রধানত দুই প্রকার নদী এখানে প্রবাহিত হয় - নিত্যবহ ও অনিত্যবহ। নিত্যবহরা বরফগলা জলে পুষ্ট এবং উত্তর ভারতে প্রবাহমান। বাকিরা মূলত বৃষ্টির জল থেকেই বয়ে চলার রসদ পায়। বিভিন্ন কারণে এই স্রোতস্বিনীরাই হারিয়ে যেতে বসেছে। কাবেরী নদীর চল্লিশ শতাংশ শুকিয়ে গেছে। কৃষ্ণা ও নর্মদাও হারিয়েছে তাদের জলপ্রবাহের ষাট শতাংশ। এইভাবেই ধুঁকতে ধুঁকতে ভূখন্ড থেকেই মুছে গেছে কেরালার ভারতপুঝা, কর্নাটকের কাবিনি, তামিলনাড়ুর ভাইগাই, ওড়িশার মুসাল, মধ্যপ্রদেশের শিপ্রা, গুজরাটের লুনি, হিমাচল প্রদেশের ঘগ্গর, রাজস্থানের সরস্বতী, নয়াদিল্লির রোহিনী.....। তালিকা দীর্ঘ না করে বরং তাদের বিলুপ্তির কারণটা জেনে নেওয়া যাক।

ভারত এখন জনসংখ্যায় বিশ্বসেরা। ১৪০ কোটি ভারতবাসীর কাছে এত বড় ভূখণ্ডেও স্থান সংকুলানে সমস্যা। শহরের মাঝ দিয়ে বয়ে চলা অনেক নদী তাই আবর্জনা আর আবাসনের সাঁড়াশি চাপে খালে পরিণত হচ্ছে। তারপরেও মহামূল্যবান মাটি এড়াতে মেট্রোরেলের ব্রিজ তৈরি হচ্ছে খালের গতিপথের উপর দিয়ে। দিল্লি শহরের প্রধান নদী, তাজমহলের প্রাণভ্রমরা - যমুনা বর্তমানে দূষণে জেরবার। বস্তি এলাকার জৈব বর্জ্য, রঙ কারখানার রাসায়নিকের বদান্যতায় নদীর কালো জলে ভেসে বেড়ায় রঙিন ফেনা। যে নদীর নাম কৃষ্ণলীলার সাথে ওতপ্রোতভাবে জুড়ে রয়েছে, তাতে এখন স্নান করার অনিবার্য পরিণাম - চর্মরোগ। পিছিয়ে নেই দেশের প্রধান নদী, গঙ্গাও। এই নদীর দু তীরে অবস্থিত ৯৭ টি বড় শহর থেকে রোজ ৩০০ কোটি লিটার নিকাশি বর্জ্য মেশে 'পূণ্য'সলিলা জলধারায়। যার খুব সামান্য অংশই শোধিত হয়। ফলে গঙ্গাজলে ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, সিসা, আর্সেনিকের মতো অত্যন্ত ক্ষতিকারক মৌলগুলি অতি সহজলভ্য।

অন্যদিকে সহজলভ্য হয়েছে বালি। সবুজ ধ্বংস করে পরিকাঠামো তৈরীর বিপুল চাহিদায় বালি খাদান এখন লাভজনক ব্যবসা। নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে বালি তোলায় তৈরি হচ্ছে গভীর নদীখাদ। তাতে ব্যাহত হচ্ছে নদীর স্বাভাবিক গতিধারা। ফলশ্রুতি, নদীর অপমৃত্যু। ময়ূরাক্ষী নদীর উপনদীর নাম বক্রেশ্বর। এককালে বহমান নদীটি বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ফ্লাই অশ্ব্যাশ ও বর্জ্যের ভার বইতে না পেরে বর্তমানে মৃতপ্রায়।

সভ্যতার 'আরো চাই, আরও ' মানসিকতা নদীকে শাসন করতে উদ্যোগী হয়েছে। যোশীমঠে ধৌলিগঙ্গা, ঋষিগঙ্গা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে নির্বিচারে গাছ কাটা হয়েছে। তৈরি হয়েছে বিপদজনক টপ্পানেল। তার ফলও আমরা পেয়েছি হাতেনাতে। তাতেও লাগাম টানার লক্ষণ কোথায়! বাঁধের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে বর্তমানে বিশ্বে বাঁধের মোট সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার ছাড়িয়েছে। চিন এগারোটা বড় বড় বাঁধ তৈরি করে বদলে দিয়েছে মেকং নদীর গতিপথটাই! এখানেই না থেমে, তাদের দেশে বয়ে চলা ব্রহ্মপুত্র নদ বা ' ইয়ারলা '-র উপর গড়ে তুলছে সুপার ড্যাম। যা হবে বিশ্বের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (ক্ষমতা - ৬০ গিগাওয়াট)। এরপর ব্রহ্মপুত্রও বাঁচবে তো?

নদী সভ্যতাকে পালন করে। বন্যা শেষের পলিই একমাত্র উপহার দিতে পারে সুগন্ধী সোনা মুগ। সেই নদীকে আমরা এখন শাসন করছি। অনিঃশেষ ব্যবহার করছি নিজেদের ভোগের প্রয়োজনে। এভাবে নদীকে শেষ করলে, শেষ হবো আমরাও। শেষের সে দিন না দেখার শর্ত তাই একটাই - নদীকে বইতে দেওয়া - নির্মল ; অবিরল।

কবিতা ও ছড়া

খবর সোজাসুজি'কে
সুনীতি মুখোপাধ্যায়

মাত্র দু'চার পৃষ্ঠা-গাঁথা **খবর সোজাসুজি** --
কুড়িয়ে আনে ঘুরে ঘুরে হরেক গলি ঘুঁজি
এলাকারই এখান-ওখান সেইখানে কি খবর --
গেঁথে দেওয়ার গুনে, আহা, বেশ তো লাগে জবর !
ফেরিও'লা হয়েই ঘোর খবর পৌঁছে দিতে,
দেখবে, সবাই মন খুশিতে হবে মনের মিতে।
টুকরো খবর, হোক তা ছোট, ব্যাপারটা যে বড়,
সেই খবরেই মন্দ যারা, ভয়েই জড়সড়।
ভালো-মন্দ থাকবে দুই-ই, মন্দকে দাও ছন্দ,
ব্যস, তাহলেই ঘুচবে বিবাদ- বিভেদ এবং দ্বন্দ্ব।
খবর সোজাসুজি ঘুরুক এই পাড়া - ওই পাড়া,
তারাই আসুক সামনে,আহা, পিছনের রয় যারা।
খবর সোজাসুজি করুক আবর্জনা দূর,
বিবাদে নয় সংবাদে সব মন হ'ক ভরপুর !
এই এলাকার অভাব- দাবী ধরতে হবে তুলে,
সংবাদেতেই মন্দ-মানুষ বিবাদ যাবে ভুলে।
খবর সোজাসুজি বাজাক দুঃখ ভোলার বাঁশি,
খবর সোজাসুজি ফোটাক সবার মুখে হাসি।
পথের ধুলোর খবর ছাপা হ'ক না স-সম্মানে,
ধুলোই তখন আবির হয়ে সবার কাছে টানে।
ছোট্ট কাগজ,খুচরো খবর কিন্তু বড় -- কাজে
একত্রিত ছোটই লাগে দেশকে গড়ার কাজে।
খবর সোজাসুজি ফোটাক সবার মুখে হাসি,
শিউলি ফুলের মতন তারা ঝরুক রাশি রাশি।
হাঁটতে হাঁটতে পথের বুকে রাখুক পদচিহ্ন,
বলুক হেঁকে,আমরা সবাই এক, নই ভিন্ন।।
শারদীয়ার শুভেচ্ছা যাক পৌঁছে ঘরে ঘরে,
সম্প্রীতির বৃষ্টি যেন আকাশ থেকে ঝরে !

দাবদাহ
সৌরভ আষ

শুরু
অবসান; আশঙ্কা'র...
না ,পশ্চিমি ঝঞ্ঝা কিংবা টর্নেডো নয়...।

ষষ্ঠ মহাবিপর্যয়....
সমতলভূমে....
বিশ্বায়নী থাবায় ।

ফোরকার্স্ট
ফর্টি টু ডিগ্রী টু ফর্টি ফাইভ
চড়চড়িয়ে বাড়ছে পারদে...।

গলা ভিজানো-র
দই-লস্যি কিংবা কোক
বিপননী মোড়ক...।

তবু;
হয়ত .... এইসব সংশয়.... ভবিষ্যত ....প্রশ্নচিহ্ন বয়.... ?

মন্দ কথা (শ্রীমন্দ)

সীতা থাকে বহুতলে
সোনার হরিণ রাম খুঁজে যায়
গন্ডীতে হাত পাতে না কেউ
আমানতে সুদ কাটে হায় !

কবিতা, ছড়া ও গল্প

গাছ

রমাকান্ত পাঁজা

জানেন স্যার, আজ আপনার কথা খুব মনে পড়ছে
সেদিনও ছিল শিক্ষক দিবস,
আপনি স্কুলের বারান্দায় একেবারে একা
আমি আপনাকে একটা পেন দিয়ে প্রণাম করেছিলাম।
আপনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে
উদাস মনের বৃষ্টি পড়া দেখছিলেন।
আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম,
' কি দেখছেন স্যার এমন ভাবে! '
আপনি দৃষ্টি না সরিয়ে বললেন '' জীবনটাকে দেখছি, ''
বললাম, দেখাবেন স্যার আমাকে?

তখন আমার দিকে তাকিয়ে পাঞ্জাবীর পকেট থেকে
ভাঁজ করা রুমালটা বের করে, চশমার কাঁচটা --
মোছারা,আছিলায় চোখের কোলটা মুছেছিলেন।
সামনের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে বললেন,
'' ওইদিকে দেখ, কিছু দেখতে পাচ্ছিস? ''
বললাম,' একটা শুকিয়ে যাওয়া গাছ স্যার!'
বলেছিলান,''ওটাই আমাদের জীবন, প্রকৃতি থেকে নেওয়া
রস আর আলোয় আমাদের বেড়ে ওঠা। ''
গাছেরা চাইতে পারেনা কিছু,
প্রাপ্তিটুকু রেখে দেয় শিকড়ের সমৃদ্ধির জন্য।
আর শিকড়- শক্ত করে ধরে রাখতে চায়
ক্ষয়িষ্ণু শিক্ষা আর ভেঙে পড়া সুসংস্কৃতির মাটিকে।

তারপর সারাজীবন শুধু দান আর,দান
ফুল, ফল, পাতা, শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে দিই চেতনা,
গড়ে ওঠে সুন্দর সমাজ।
এক সময় অযত্নে শুকিয়ে যায় এ জীবন,
দেখ, মৃত্যুর পরও কেমন পথ নির্দেশক হয়ে আছে গাছটা।
নীচের দিকে তাকিয়ে দেখ, কি দেখছিস?
' অনেক চারা বের হয়েছে স্যার, '
এরা দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পরবে একদিন,
পানি আর জলের প্রভেদ রাখবে না,
কাস্তে চাঁদকে বর্ধিত করতে করতে
ঝকঝকে রূপলী থালায় পরিনত করবে।
এই চিন্তা চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে
গড়ে উঠবে সবুজ নির্মল পৃথিবী।

সেদিন এই গাছটা হয়তো থাকবে না
বেঁচে থাকবে তার ভাবনা, চেতনা,
পারিস তো চারাগুলোকে রক্ষা করিস।

অনুগত

অরুণকুমার মান্না

চশমার শান্ত ছায়ায় অলস চোখ
ঝুড়ি নামা বয়েস যা ইচ্ছে হোক।

আর ভিড় করে না বসন্ত বাতাসেরা
অনেক রাত্রি মাড়িয়ে আলোয় ফেরা

যে আলোর দৃশ্যে নিপাট শান্তি
আমি অনায়াসে মন পেতে দি।

মন এখনো খাঁচায় কৃষ্ণ রাধে
মৃত্যু চরকা কাটে খোলা ছাদে

সুতো নিচে নামে ক্রমাগত
আমি মৃত্যুর অনুগত।

কবিতা ও ছড়া

কাশফুল

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

কাশ ফুলেদের জমাট মেলা
দামোদরের চরে,
সাদা - সাদা.... কেবল সাদা
সাদার খুশি ঝরে !
কে যে ওদের দেয় বা বলে
শরৎকালে ফুটতে,
এমন করে নদীর চরে
দল বেঁধে সব জুটতে !
বইছে নদী,কইছে কথা
কাশ ফুলেদের সঙ্গে,
এবার তোরা আসর সাজা,
দুগ্গা এলো বঙ্গে।
কাশ বললেই সাদা,
সাদা বললেই কাশ,
দেদার ফোটে এধার ওধার
শরৎকালের মাস।

লঘু গুরু

সুব্রত মিত্র রানা

শব্দ ব্রম্ভ তার ব্রম্ভের ভয়
সোজা কথা সোজাসুজি রানা কবে কয়
।
রবি মামা দেয় হামা
গায়ে জামা লাল
কবে হবে সাবালক
ভাবি কাটে কাল
।
দারোযান গায় গান
রাম নাম ওই
মাভৈঃ মাভৈঃ

আমায় লোকে ছাড়তো কি ?

রাম চট্টখুণ্ডী

বলবো কী আর সাত্যকি
তোদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলে
জেতে ওদের সাধ্য কী ?
কিন্তু ওকি করলি রে ?
সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে এসে
ডোবায় ডুবে মরলি রে !
ঢিলে ঢালা বল না পেলে
ওরা অমন মারতো কি ?
বল করলি এলো মেলো
চার-ছয় জোর পিটিয়ে গেলো,
ছ-ছটা ক্যাচ্ না ফেললে
জিততে ওরা পারতো কি ?
ব্যাট্ কাঁধে তো ক্রিজে গেলি
শূন্য রানে ফিরে এলি !
সঠিক খেলা খেললে পরে
তোদের এ টিম হারতো কি ?
দ্যাখ্ তো ভেবে সাত্যকি
আমার এতে স্বার্থ কী ?
আবার তোকে দলে নিলে
আমায় লোকে ছাড়তো কি ?

তোমাকে খুঁজতে গিয়ে

মমতা চক্রবর্তী

তোমাকে খুঁজতে গিয়ে----
জনারণ্য থেকেগ্ধ পাহাড়,
গ্ধনদীর চড়াই--উৎরাই
বনভূমি থেকে চিল্কা
তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে
চলে গেছে---- কতো মধুমাস।

ধনেশ পাখির অসহায় ঠোঁটে
পরিযায়ীগ্ধ পখিদের ভীড়ে---
তোমাকে খুঁজতে অনেক
গ্ধতোমাকে খুঁজতে গিয়ে--
হারিয়েছি পথ ও পাথেয়
ভুলেছি একান্তগ্ধ অবকাশ।
ভাঙা ফুটপাতে---
বাসস্ট্যান্ডে, স্টেশনে
ছেঁড়াগ্ধ আস্তিনে
শতচ্ছিন্ন--ধূলোবালি মাখা--
মানুষের ভীড়ে
তোমাকেই খুঁজে পেয়েছি....

সময় ঋণ

শম্পা ঘোষ

নীল রং থেকে কর্কটক্রান্তি রেখা পর্যন্ত ছেয়ে আছে উদাসীন পাটিগণিতের হিসেব,
দূরত্বকে হারিয়ে যেতে দেখি কখনো কখনো নিজস্ব ভঙ্গিতে
বৃষ্টি ধারারও একটা গোপন ব্যথা থাকে,
ভিজে যাওয়ার শিহরণে ভুলে যাই তাকে।
মরীচিকা সংবাদের হঠাৎ বুকে ব্যথা ওঠে
জীবন পুড়ে ছাই দাবদাহে পাওনার হিসাব গন্ডা হাতরাতে থাকে ঋণ,
যেভাবে ঘাম চিহ্নে লেখা থাকে না কোন অনুভূতির গল্প
ঘড়ি কাঁটার কোনো অবসর নেই।
অস্থির ছুটন্ত লোলুপোতায় তবুও মন বিশ্বস্ত শান্তি চায়, প্রাগঐতিহাসিকতা
কিন্তু উপেক্ষা করার নয়।

কবিতা ও ছড়া

কাব্যিক প্রতিশোধ

বিশ্বজিৎ সিনহা

তেতাল্লিশ এর মন্বন্তর ,ছেচল্লিশ এর দাঙ্গা,
একাত্তরের জয় বাংলা যুদ্ধ --
বিপর্যয় তো ডেকেছি অনেক
হারিয়ে চৈতন্য সাবেক
ভুলেই গেছি হৃদয় মাঝে বুদ্ধ।

বারংবার সংকেতেও,সতর্ক নয় তবু,
নাগাসাকি নয় ভুলুক মানুষ-
প্রকৃতি ভোলেনি কভু।
নীরবে মানুষ প্রকৃতি করেছে ধ্বংস ,
বিপন্ন তাই হয়েছে আজকে 'কংস'!
যে ভাবত নিজেকে একেশ্বর ও সর্বশক্তিমান
তার আর আজ নেইকো পরিত্রাণ।
(দেখছে)অহংকার এর পতন আজকে বিশ্ব-
কেই বা গুরু, কেই বা যে কার শিষ্য!

প্রকৃতিই আজ বলছে সজোরে হেঁকে ঞ্জ
দেখনি আকাশ গিয়েছে আঁধারে ঢেকে,
হায়রে, তোমরা কি ভীষণ নির্বোধ--
দেখো, দেখো খোকা--
নিচ্ছি কেমন কাব্যিক প্রতিশোধ!

মা তুমি ভালো নেই

অভিজিৎ পাত্র

আর সভ্যতা কত হবে নগ্ন
নুয়ে পড়ে মেরুদন্ড, ভঙ্গুর এ ভগ্ন।
এটাকে কি বলছো তোমরা স্বচ্ছতা
দেশের খুন লাগায় জাতি দাঙ্গাটা
কেড়ে নেয় ইজ্জত মান সম্মান দেশের,
টেনে হিঁচড়ে হিংস্র এর মতো অভাগীমায়ের কাপড় !
আগুন লাগে বাংলা,লাহোর, রাজস্থানে,
নারী সত্তা, লুটপাট নির্মম হত্যা করতে শুধু জানে।
চিৎকার করে উঠি,জন্ম দেয় কোন নারীর জঠর,
পাথর করেছো মন নির্মমতা আজব তবু হয়েছে কঠোর।
শবে ছেয়েছে গোটা দেশ রয়ে যাক প্রতিবাদ
রক্ত ফুটছে শিরা ধমনীতে।এক হও রেখো সকলে কাঁধে কাঁধ।
আবারও এই বর্বর নিষ্ঠুরতা সমাজের কোণায় কোণায়,
হোক বিদ্রোহ ঘোষণা নব যুদ্ধ ঠিক যেন জন্মায়।

স্বপ্ন মাখা প্রকৃতির বিধান

অখিল চন্দ্র পাল

শীতল জলে ভিজে গেছি উথালী নয়নে।
অষ্টাদশীর মনটা আমাকে উন্মুক্ত হাওয়ায় উড়ন্ত পাখির মতো দিশা হারায়।
শিশুর হাসির মতো- স্নিগ্ধ বাতাস আমাকে দোলা দেয়- রঙ বদলায়।
মনটা নবীকরণে- তেপান্তরের ওপারে জুঁই,চাপা,মালতির আবেশে শূণ্য হৃদয়ে চাঁদ উঠে।
জীবন লিপিতে স্বপ্নভরা উদ্দীপনার ভাবনাতে হৃদয়ে সোনার দেশ গড়ে,-- সোনালী আনন্দ সৌরভে।

আমি দীন ভিখারী পথিক, বর্ণিল রূপে- অলঙ্কারে - দীপ্ত পল্লবে কল্পনার আঙিনাতে তো ফুল ফুটে না।
এতো স্বপ্নমাখা -- প্রকৃতির বিধান

কবিতা ও ছড়া

ছায়া পথিক
শেখ সিরাজ

আলো ছিল গান ছিল
সেই জলসায়
আমার হাতে অনেক কাজ ছিল
তবু পেলাম তোমায়।
গন্ধ যেমন ছড়ায় ফুল
আপন মনে সুরে
তেমনি তুমি ছিলে প্রাণে
আমায় ঘিরে ঘিরে।
আমি তোমার ঝাড়বাতি
জ্বলন্ত ইশারায়
আমি মোম পুড়ে হয়েছি তরল
তোমার আঙিনায়।
তোমার চোখের ফাঁকে
আমি ক্লান্ত ছায়া পথিক
আমি ছিলাম রাজকুমার
নাকি শুধুই অতিথি ?

শরৎ রানি
দীপঙ্কর বৈদ্য

নীলাকাশে হাসির রাশি
সাদা পেঁজা তুলো,
কাশের দোলায় শিউলি ফুলে
দুঃখ কষ্ট ভুলো।

শরৎ রানি পুজোর ছন্দে
হাসে হেলে দুলে,
মিষ্টি গন্ধে শিশির বিন্দু
ঝরে ফলে ফুলে।

পদ্ম পাতায় প্রেমের ছোঁয়া
হৃদয় টলোমলো,
সবুজ বুকে খুশির বাগান
বৃষ্টি ছলোছালো।

দুর্গা মাতা বসুন্ধরায়
আগমনীর সুরে,
নতুন আলোর বার্তা নিয়ে
আসে বছর ঘুরে।

ভালোবাসার দিগন্ত
তরুন কুন্ডু

সোনালী, আজকাল তোমার কথা খুব মনে পড়ে

নীরব রাতের মাঝে আমি একাকী বসে থাকি
বসে থাকি ঘরের বাইরে খোলা আকাশের নীচে
ধূপ পোড়ে না ,হরিণাম হয় না কোন বাড়ীতে
ঠায় বসে থাকি তোমার অপেক্ষায়।

সোনালী, আজকাল তোমার কথা খুব মনে পড়ে

জোরে জোরে হুইশেল বাজিয়ে
রাতের শেষ লোকাল চলে যায়
আমার চশমা পড়া চোখ ঝাপসা হয়ে আসে
ঝাপসা চোখে বসে থাকি তোমার অপেক্ষায়

সোনালী, আজকাল তোমার কথা খুব মনে পড়ে

এই নীরবতার মাঝে,ঘরের বাইরে
ঠিক বারো বছর আগের
স্মৃতির বিমূর্ত কার্টুন বেরিয়ে আসে
স্মৃতির মাধুর্য নিয়ে বসে থাকি তোমার অপেক্ষায়।

মন্দ কথা (শ্রীমন্দ)

তোমার ঘরের আবর্জনা
পরের দোরে ফেলে ফেলে
এমনি করেই স্বচ্ছ তুমি
পড়শিরা যাক রসাতলে

কবিতা ও ছড়া

রুক্মিনীর দ্বিতীয়তা
মাধুর্য্য দত্ত

হাতে হাত রেখে অঙ্গুলাঙ্কের ঘ্রাণ
অপরের দিকে ভাঙা গিটার হাতে সুর তুলছে রিপু করা শার্ট এ
তবু তোমার ঠোঁটের রামধনু, কথার টংকার শঙ্খ-রাগের মত

কল্লোলে কৃষ্ণচূড়ায় আনে পীতরক্তিম আভা... যেনো আগুন
ফাগুন যেনো মুখরিত... কালের আদিম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে

জলে পা ডুবিয়ে বসে খোস মেজাজে তুমি কৃষ্টি করে চলেছ বাক্যের তরুলতা
আমি বৃষ্টি , সেতো একা আসে না যে সে সুখের মায়াজালে
বান-ভাসি আমি, খেয়াল নেই তার জলের তোরে খেই হারিয়ে মাঝ সলিলে

দেহের সাথে আত্ম সেতো একাকার
কই আমি তো ভাবি না ক্ষ্মআবার আসিব ফিরেক্ষ্ম
তবু কি আছে সেই সোনার কেল্লা... জাতিস্মর
না আছে সেই অম্বা অম্বিকারা...

হারিয়ে যাই সেই রসাতলে পাতাল নাকি নরক
জলাঞ্জলী দিয়ে সেই চোখের চৌম্বকত্ব আর মোহ
ফিরিয়ে চলেছি জীবন যৌবনের ভাঙা রোজনামচা
টাকায় যখন জীবন কেন যায় তখন জীবনের আর মূল্য রইলো কোথায়?

কোথায় বা মানুষ খোঁজে হৃদয় ছুয়ে হৃদয়ের তরঙ্গায়িত সেই মুহূর্ত
রাধা বিরহে কেনোই বা দাগ কাটেনি রুক্মিনীর চিরকালের দ্বিতীয়তা
তবু আমরা ফিরে আসি সেই প্রেমের জোয়ারে
ভেসে যাই সেই অসীম তারা খচিত নীলাভ দিগন্তের কিনারে...!

ঋণ
দেবীদাস নন্দী

চতুর্দিকে ধূপ আর রজনীগন্ধার মিষ্টি সুবাস,
দুহাত ভরা শুভেচ্ছা,উচ্ছলিত হৃদয়াবেগ,
বিচ্ছেদ বেদনা বিধুর দুচোখের জলধারা
বড় পিচ্ছিল সুমুখের রাজপথ,

প্রাপ্তির ঝুলিটি হয়েছে একটু বেশিই ভারী
কিছুই যাবে না,মাথা ঝুঁকিয়ে তবু কুড়োই সব,
প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু পরমাণু ত্রস্ত হাতে,
যদিও জানি, পারবো না দিতে কিছুই প্রতিদানে

থেকে যাক না কিছু ঋণ যা অপরিশোধ্য চিরদিন....

ভাই এর দুষ্টুমি
প্রাপ্তি পাল

ভাইটি আমার দুষ্টু ভীষণ
মাতিয়ে রাখে বাড়ি
ঘুমলে খোকা জুড়ায় পাড়া
সকলে হাঁফ ছাড়ি।
এটা ভাঙছে, ওটা ফেলছে
কতই যেন কাজ- আলতা নিয়ে মাখছে মুখে
আহা..., সেকি সাজ! বকলে ও-কে উল্টো ছিরি
ধুলোয় গিয়ে শোবে মারতে গেলেই ছুটে গিয়ে
গাছের পাতা খাবে!
খবরের কাগজ কুঁচনো দিয়ে
শুরু করে ও দিন আমার যত মোম রঙেতে
দেওয়ালরা রঙিন।

ভাইটি এমন দুষ্টু, তবু -
বড্ড বাসি ভালো,
ওর হাসিতেই ঝরতে দেখি
হাজার চাঁদের আলো।

কবিতা ও ছড়া

ফিরিয়ে দাও

বিদ্যুৎ ভৌমিক

বলেছিলে ফিরিয়ে দেবে
দাও,আমার সব ফিরিয়ে দাও
অমল সংগীত উজ্জ্বল প্রদীপ্ত দিন
রক্তের আড়ালে ইতর আরাম আমি চাই না
মৌন যন্ত্রণায় মুক্তির বারুদ জীবনের ঋণ
আমি সব ফিরে পেতে চাই,
আমার ফিরিয়ে দাও, দাও
সেই শৈশব সকাল মুগ্ধ মনোরম ইতিহাস
জীবনের উদ্দাম উত্তাপ
দুনিয়ার দ্বারে ঘৃণার বাতাসে সংসার কুয়াশা
বাঁচার নেশায়
আলোকিত জীবনের দিনে
স্পন্দিত বুক রক্তিম নিশান
জীবনের সুস্থ আবাদ চাই

বলেছিলে ফিরিয়ে দেবে, দাও ।।

এই শরতে

সিদ্ধেশ্বর দত্ত

নীল নীল নীলাকাশ শিল্পীর তুলিতে
রাশি রাশি এত নীল ছিল কার ঝুলিতে!
সাদা মেঘ ছবি আঁকে শরতের গন্ধে
কাশফুল দুলে দুলে মাথা নাড়ে ছন্দে।
গাছে গাছে থোকা থোকা শিউলিরা হাসছে
শিশির মুক্তো সম ঘাসে ঘাসে ভাসছে।
মধুকরে দেয় ডাক সরোবরে পদ্ম
আগমনী বার্তায় ফুটেছে সে সদ্য!
রামধনু রাঙা হয় আকাশের কিনারে
দিকে দিকে মাথা তোলে বাঁশ কাঠ মিনারে!
নানা রঙা বেশে ঐ মণ্ডপ সাজে রে -
রিনিঝিনি খুশি খুশি মিঠে সুর বাজে রে!
কোথা যেন বেজে ওঠে ঢাকের ঐ বাজনা,
চলো পড়ি জামা- জুতো, বাকি কথা আজ্ না !!

বর্ণের বন্ধ্যাত্ব

বন্দনা মালিক

ভাবনার করিডোর থেকে ফিরে যায়
দিগন্তে উড়ে চলা ভাবনাগুলো,
এলোমেলো চেতনার স্বপ্নীল আভায়
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয় বর্ণহীন বর্ণমালার।

শহরের বুকে হেটে যায় নীলাক্ষী যুবতী
শরীরের ভাজে ভাজে লিখে রাখে
অলস অক্ষর----
সুবাসহীন সৌরভে শব্দ গাঁথার মালা গাঁথে
জীবন নদীর দিশাহীন কবি।

যে কলম ভেঙে গেছে চেতনার বিদ্রোহে
তার কপোলে চুম্বন দেয় রংহীন রামধনু,
কালিদের হরতালে উদোম নৃত্য করে
সংস্কৃতির লেবাসী প্রেতাত্মা।।

একটু মিষ্টি করে হেসো

সুফি রফিক উল ইসলাম

একটু মিষ্টি করে হেসো আমার জন্য
চোখ মুখ কুঁচকে ব্যঙ্গের হাসি নয়,
জ্ঞানগর্ভ গম্ভীর বিজ্ঞের হাসি নয়
নয় কোনো অনাবশ্যক কৃত্রিম উচ্ছাসী হাসি।
সুন্দর সাবলীল সুস্থ হাসি রেখো আমার জন্য
যে হাসিতে আছে বাঁচার নিঃশ্বাস।
স্বপ্নের সৌরভ সে হাসি সোনার চেয়েও দামি
সেই হাসি ফিরে পেতে চাই আমি।
শ্বসুস্থ হাসি সামান্য হলেও জীবনের অনুপান
তাকে অনাবশ্যক নগ্ন করে কোরো না খানখান।
আমার জন্য জমিয়ে রেখো একটু মিষ্টি হাসি ,
আমার অনেক কর্মব্যাকুল সময়ের বিনিময়ে
পেতে চাই একটু মিষ্টি হাসি।
একফালি নতুন চাঁদের মতো
একটু মিষ্টি করে হেসো।।

কবিতা ও ছড়া

এ এক অন্য চিলেকোঠা

রাসমণি ব্যানার্জী

আজ বলবো অন্য এক চিলেকোঠার কাহিনী
যা আমি কোনদিন কখনোই চাইনি।
চিলেকোঠার স্মৃতি মনে পড়লে আজও ভয়ে কাঁপি
মনে পড়ে যায় বিজনের চলে যাওয়া
অভিশপ্ত অতীতের সেই ঝাঁপি,
মনের মাঝে হাজার কষ্ট আজও তাই পাওয়া।
চিলেকোঠায় তিলের বস্তা প্যাঁকাটির গাদা থাকতো
তখনকার মানুষ সেখানে অনেক কিছু রাখতো।
দুপুর হলেই আমি মণি আর বিজন
চিলেকোঠায় খেলামপাতি খেলা চলতো তখন।
এমন এক তপ্ত দুপুর বেলায় ঘটলো অঘটন
অসাবধানতায় বিজন ডেকে আনলো তার মরণ।
আগুন আগুন করে চিৎকার
মরে গেল ছেলেটা মরে গেল
গোটা পাড়ার লোক একত্রিত হলো
চিলেকোঠার ঘরে ছোট্ট বিজন
খেলার ছলে প্যাঁকাটিতে আগুন দিল
সেই আগুন আমার বন্ধু বিজনের প্রাণ কেড়ে নিল।
অতীতের সেই চিলেকোঠার কথা মনে পড়ে যায়
মনটা ডুকরে কেঁদে ওঠে হৃদয় করে হায় হায়।।

মন্দ কথা (শ্রীমন্দ)

পলিপ্যাকে বর্জ্য ভরে
সংগোপনে ফেলেন পরে
মোজাইক-এর গিন্নি তিনি
পরিপাটি সবার মতে

স্মৃতি

জ্যোৎস্না হালদার

ভালোবাসার গহীন গহনে
আজ হয়তো পড়েছে ভাঁটা
তবু একদিন তো এই হাত
ধরেই হয়েছিল জীবনের
অনেকটা পথ হাঁটা।
কত প্রত্যাশায় একে অপরের
মন দেওয়া নেওয়া হয়
জীবনের ঘূর্ণিপাকে শেষে
সেই অভিমানেরই হয় জয়
পরে থেকে যায় ভাব বিনিময়
আর সুখ দুঃখের কতশত কথা
প্রেমের উত্তাপে মাপা
যায় কি সে কথার গভীরতা?
একদিনের গভীর প্রেমের উপস্থিতি
আজ যেন একমুঠো শুধু স্মৃতি
আর সেই স্মৃতি আঁকড়ে তোমাকে
জানাই শুভেচ্ছা আর প্রীতি।।

দেখা

সুব্রত মিত্র রানা

'কেউ সে পিঁড়িতে এসে এখনো বসেনি'
বসার কথা ছিল যার...
যেতে দাও
চলে যেতে চায় কেউ? যেতে দাও

দেখ। শুধু দেখে যাও
যেভাবে বৃক্ষ দেখে
পাখির উড়ে যাওয়া

কবিতা ও ছড়া

স্বরাজের ভাবনা

ডাঃ সেখ সাবের আলি

আশার আলো দেখছে ধরায়
এইবার আসবে পার্বতী,
স্বাধীন বাংলার স্বাধীন স্বাদ
স্বরাজ পাবে একরতি।

পূজার সময় একদিন ছুটি
ধোবেনা চায়ের কাপ,
মায়ের পায়ে সুঁপে দেবে
সব দুঃখ মনঃস্তাপ।

দুখুমিঞার দুঃখ, বিদ্রোহ তাকে
শেখায় যেমন বাঁচতে,
স্বাধীনতার ভাবনাগুলো তেমন
ভাবায় দিনে -রাতে।

একদিন সে হবে স্বাধীন রাজা
আসন হবে সিংহাসন,
শিক্ষার আলো জ্বালবে দেশে
দেবেনা মিথ্যা ভাষন।

শিশুশ্রমিক থাকবে না আর
শিশুরা পাবে সম্মান,
শিক্ষার আলোয় করবে খেলা
মায়েদের জুড়াবে প্রাণ।

স্বাধীন দেশের স্বাধীন ভাবনায়
গড়বে মনুষ্যত্ব মানবতা,
বীরের মতো উচ্চে তুলি শির,
সে পুজিবে দশমাতা ।

অভিমান

মন্দিরা মুখার্জ্জী ব্যানার্জ্জী

তোর প্রতি আমার এক আকাশ ছোঁয়া গলায় দলা পাখানো অভিমান ,
দুচোখ ভর্তি রাগ ঠোঁটের কোণে অভিযোগ পাহাড় প্রমান ।
তবু মন বলে তুই কাছে এলেই ভুলে যেতে পারি মনের গ্লানি সব ,
অভিমান করে বলেছি 'দিনতো ফুরোল' আবার দিন শেষে করিসনা কলরব।
এবার তবে আসি,
মত পাল্টে ফিরে এসে
দেখি বন্ধ দুয়ার,
ভেবেছিলাম হয়তো তুই অপেক্ষায় রত বসে আছিস আরাম চেয়ারে।
তোর মায়াময় মুখমন্ডল বড্ড
দেখতে ইচ্ছে হয় যে প্রিয় !
তোকে যে ভীষণ ভালোবাসি
হয়নি অবসর হই নি আজো অপ্রিয়।

রবীন্দ্রনাথ

গোপালী গঙ্গোপাধ্যায়

রবীর আলোয় জাগি সবাই
রবীর আলোয় হাঁটি,
রবীর আলোয় ভুবন ভরে
মানুষ হবে খাঁটি !
অ-আ-ক -খ সাজিয়ে বাগান
ভরবে ফুলে ফলে,
ভ্রমর অলি গুনগুনিয়ে
আসবে দলে দলে !
গান শোনাবে ময়না টিয়ে
রূপসি নদীর পারে ;
আকাশ বাতাস উদাস হবে
সুরের ঝঙ্কারে !
গানের কথা, জ্ঞানের আলো,
হয়নি আজও ফিকে ;
আপন হারা মাতোয়ারা
ঝরছে দিকে দিকে।।

কবিতা ও ছড়া

মানুষ

বিভু মুখোপাধ্যায়

মর্গের লাশের থেকেও ভয়ঙ্কর
হঠাৎ করে, মানুষের ভাল থেকে
মন্দ হয়ে বদলে যাওয়া !
মদ্যপ পুত্র মাকে আঠারো দিন
তালা বন্ধ করে বন্দি রেখে
পরে খুন করে দেওয়া !

ভাবনার ছুটি

রাফিয়া সুলতানা

ভাবনা তোমায় রাখবো না ধ'রে
বাঁধবো না আমি আর-
কবিতার ফাঁদে, শব্দের বাঁধে
ছন্দে শিকলটার!

যাও তুমি যাও! মুখ না ফেরাও
এদিকে কভু আবার-
দিয়েছি ছুটি এ , পড়ো গে লুটিয়ে
ধুলিতে আকাশ পার!

হবো ভবঘুরে, সন্ন্যাসী বেশে-
যাবো দ্বার থেকে দ্বার,
পথে পথে ঘুরে, যাবো বহুদূরে
পেরিয়ে সে পারাবার!

কত শত ভুখী, রয়ে দীন দুখী
নীতি করে হাহাকার,
তাদেরঞ্চই সে ভিড়ে যাবো আমি ফিরে
ভুলে সুখ কামনার!

হবো পরবাসী, অশ্রুতে ভাসি
সাথে এই দোতারার,
বাউলের সাজে মিশে যাবো মাঝে
বিশ্বের দরবার!

যখন বর্ষা এলো

সেখ মোহাম্মদ ইউনুস

জৈষ্ঠ্যের প্রখর দাবদাহ
অস্থির প্রাণ করে হাঁসফাঁশ,
পাখার বাতাসও ছড়ায় উষ্ণতা
ওষ্ঠাগত প্রাণ পেতে চায়
একটু শীতলাতা।
অবশেষে একদিন আকাশে দেখা দিল কালো মেঘ
ঢেকে দিল সূর্যটা নামল বর্ষা।
গাছেরা স্নাত হয়ে উজ্জ্বল হল
শুষ্ক মাটি রুক্ষতা কাটিয়ে কোমলতা পেল
শান্তির শীতল বাতাস বইল।
প্রাণীকুল ফেলল তৃপ্তির নিঃশ্বাস,
ধুয়ে গেলো মলিনতা, আবিলতা
ক্ষুদ্র লতাগুল্ম পেল নব জীবনের আশ্বাস।
ধূসর ঘাস সবুজ হল,
চাতকের চিত হয়ে বৃষ্টি পান
ভালোবাসার স্রোতস্বিনী হয়ে সব
ছুটে চলল সাগর সঙ্গমে।
জসীমউদ্দীনের বছিরদ্দি জাল
ছুটে যায় গাঙের কূলে,
নাবালক ছোটো ছেলেটি
বৃষ্টির ঝমঝম শব্দের তালে
পা নাচিয়ে, জানলার গরাদে
হাত বাড়িয়ে বৃষ্টিকে ছুঁয়ে
কবি গন্ধরাজের ছড়া কবিতা
বিরবির করে আওড়াতে লাগল,
মেঘ জমল বৃষ্টি এলো
জল থৈ থৈ মাঠ,
লাঙল কাঁধে চাষী
গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠ
হাল চালাবে ধান বুনবে
হবে সবুজ সবুজ ক্ষেত
দেবে পৌষের আশ্বাস।

আমি নারী

বিশ্বেশ্বর চন্দ্র

আমি নারী ,
আমি, ভুল করলে সন্তানকে ,
শাসন করতে পারি ।
আমি, স্নেহের বসে সন্তানকে ,
ভালোবাসতেও পারি।
হয়ত আমি সমাজ মাঝে
পুরুষের কাছে হারি ,
কিন্তু আবার, তার দুঃখে ,
পাশে থাকতেও পারি ।
আমি পারি ,
কারন, আমি নারী ।

আমি নারী ,
মায়ার বসে, কাউকে আমি
শেষ করতেও পারি ,
মাতৃ রুপে আমিই আবার ,
জন্ম দিতেও পারি ।
আমিই আবার ক্যাম্পে গিয়ে ,
রক্ত করেছি দান ।
আমিই আবার ছিন্ন মস্তা ,
রক্ত করেছি পান।
আমি পারি ,
কারন, আমি নারী ।

আমি নারী,
হয়ত আমি একটু সরল ,
রক্তকে পাই ভয় ,
কিকরে তাহলে অসুর নিধনে ,
সর্বদা করি জয় ।
কিকরে তাহলে রক্ত বীজের,
রক্ত করেছি পান ,
কিকরে তাহলে পার্বতী রূপে ,
ভেঙেছি স্বামীর মান।
আমি পারি ,
কারন, আমি নারী ।

আমি নারী,
আমিই হলাম মহা কালী ,
অসুরকে করি নাশ ,
আমিই আবার ঘরের লক্ষী,
সংসারে করি বাস ।
আমিই হলাম দেবী পার্বতী ,
অনেক কষ্ট সয়ে ,
আমিই আবার, কলঙ্কিনী ,
কৃষ্ণ পাগল হয়ে ।
আমি পারি,
কারণ, আমি নারী ।

আমি নারী,
আজকের চেয়ে, আগের আমি,
অনেক ছিলাম ভালো ।
গায়ে শাড়ি, মাথায় খোঁপা ,
হাতে প্রদীপের আলো ।
আজকে আমি মর্ডান হয়েছি ,
পরেছি জিন্স টপ ,
আজকে আমি বদলে গিয়েছি ,
করেছি চুলে পপ।
আমি পারি,
কারন, আমি নারী ।

আমি নারী,
আগের আমি, রোজ সন্ধ্যায়
তুলসী প্রদীপ জ্বালি,
আজকে ঘরটা তুলসী ছাড়া,
লাগছে নাতো খালি ।
সময়ের সাথে নিজেকে আমি,
বদলে ফেলতে পারি,
কারন হয়ত একটাই তার ,
আমি একজন নারী।
আমি পারি ,
কারন, আমি নারী।।

কবিতা ও ছড়া

নববর্ষা

বন্দনা মালিক

রুপালি রূপের পসরা
সাজিয়ে
বর্ষা এলো যে ধামে,
প্রকৃতির সাথে মন যে নাচিছে
নব জলে শিশু নামে।

শাপলারা সব বাহারি রঙেতে
ফুটে আছে খালে --বিলে,
কিশোরী বধুরা আলতা পরশে
মেঠো পথ দিয়ে চলে।

কিশোর কৃষক নাঙল কাঁধেতে
নববধূ পানে চায়,
লাজুক নোলকে আড় পানে চেয়ে
পল্লি পালিয়ে যায়।

নেই এই রূপ,নব ধরা মাঝে
ফোটে না কদম ফুল,
নগর জীবন সব কেড়ে নিছে
সরলতা আজ ভুল।

গাছ

স্নেহা মল্লিক

গাছ আমাদের প্রাণদাতা
গাছই জীবন,
গাছ না থাকলে পরে
বাঁচবে না ভুবন।
গাছ লাগাও, গাছ বাঁচাও
সমাজের তরে,
একটি গাছ লাগালে প'রে
একটি প্রাণ বাড়ে।
তাই আমি সবাইকে বলি গাছ কেটো না ভাই,
গাছ থেকে সবাই ফুল,ফল টাটকা বাতাস পাই।

প্রাণ সঞ্চার

ড. শমিতা ভট্টাচার্য

ফাগুনের আগুন লেগেছে ওই ঘাসে
দূর্বার ফিকে সবুজ ছেড়ে ঘন বনানী...
বসন্ত কি এসে গেছে ?

কোকিল আবার ডেকেছে অচেনা ঘরে
মিলনের আয়োজনে সুন্দর ধ্বনিতে
বসন্ত বুঝি এসে গেছে?

আমার আমি বসে আছি দেউলে
পাষাণটিকে যে মূর্তি করেছিল
তাঁরই অপেক্ষায় হয়তো....
গ্রীষ্ম ,বর্ষা ,শরৎ ,হেমন্ত শেষ
শিল্পীর খবর পেলাম ...
সে ব্যস্ত অন্য মূর্তি গড়তে
দেউলের মূর্তিটি যেন হেঁসে উঠল
বললো দেখ ,তোর ভালোবাসায়
আমি দেবতা হয়ে গেছি
চারদিকে মৃদু মৃদু মায়াময় বাতাস
নস্বর দেহকে যেন ছুঁয়ে গেল
এক লহমায়
বসন্ত কি এসে গেছে??

মন্দ কথা (শ্রীমন্দ)

মুরগি মরুক ময়ূর পোষো
সাত্ত্বিক দেশ একটু রোষো
ভুক্তভোগী অভুক্তরা আকাশপানে চাও
চন্দ্র জয়ে মন ভরে যাক
শুকনো হেসে যাও

কবিতা ও ছড়া

বৃষ্টি এলে
দীপঙ্কর বৈদ্য

বৃষ্টি এলে বাবুরা সব
লড়ে খুঁটির জোরে,
ভাবনার পাহাড় মাথায় তখন
আমরা পড়ি ঝরে।

একনাগাড়ে টাপুর টুপুর
হবে ভরাডুবি,
প্রথম প্রথম ভারি মজা
পরে কষ্ট খুবি।

ওই শহরে সবাই কেমন
ওড়ে পাখনা গায়ে,
এই গেরামে একা মাঠে
মরি জলের ঘায়ে।

মুঠোফোনে বার্তা ছোটে
চলে ছবির টকর,
উপকারের নামে কেবল
করে বকর বকর।

পাঠাগার
বিভু মুখোপাধ্যায়

পাঠ্যবই গল্প উপন্যাসে ভরা বইয়ের ভাণ্ডার
কারিগর হতে হবে সকলকে মানুষ গড়ার ;
রিডিং রুমে আসা চাই,খোলা আছে প্রবেশ দ্বার-
টিভি ছেড়ে সব কিছুই পড়া চাই,তোমার-আমার।
শীতকালে নবান্নের ধানে ভরে যায় খেত , খামার
পড়াশোনাই একমাত্র দাওয়াই,মানসিক অসুখ সারাবার
শিক্ষাই পথ দেখায় শিশুর পূর্ণ বিকাশ ঘটাবার।
চারিত্রিক শারীরিক-মানসিক-বৌদ্ধিক বিকাশ চাইই সবার
স্বামীজীর অমৃতকথা সকলকেই মনে রাখা দরকার।
মানুষ-সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা শেখায় আদর্শ পাঠাগার
বিশ্বের ইতিহাস, সব কিছু জানতে হলে বুঝতে গেলে
বইটা ধরো, ওটাই হবে হাতিয়ার।।

ঝড় এসেছে
মীনা রায় বন্দ্যোপাধ্যায়

মাস্তু অনু কোথায় রে সব
আয় রে ছুটে ভাই!
ঝড়ের মাতন লাগলো গাছে
আম কুড়োতে যাই।

হলুদ পাকা আম দেখেছি
রাঙিয়ে রয় গাছ,
ওপাড়ার ওই ছেলে মেয়ের
দেখ সে খুশির নাচ!

মিষ্টি রসাল আম গুলো বেশ
ভালোবেসে খাই,
আর দেরি নয় আয় রে সবে
দেখি যদি পাই।

সিঁদুরে আম দূরের গাছে
ফজলি মৌটুস পাশ,
তাড়াতাড়ি যত পারিস
আম কুড়িয়ে খাস।

মালির ছেলে আলো জ্বেলে
আঁধার বনে যায়,
ওদের ভারি মজা নিত্যি
কতো যে আম খায়।

দশঘরা ১ গ্রাম পঞ্চায়েত

(ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

- নারী শিক্ষার দিশা কন্যাশ্রী আজ সারা বিশ্বে সমাদৃত।
- একটি আর্থিক উৎসাহদান প্রকল্প হল কন্যাশ্রী। বাল্যবিবাহ রোধ করে কন্যাশ্রী।
- দরিদ্র মেয়েদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য করে কন্যাশ্রী।

আমাদের লক্ষ্য ঃ-

১। নির্মল পঞ্চায়েত গড়ার লক্ষ্যে প্রত্যেক বাড়িতে শৌচাগারের ব্যবস্থা করা।

২। জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করা।

৩। গৃহহীন পরিবার গুলিকে গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করা।

৪। পরিশ্রুত পানীয় জলের পর্যাপ্ত যোগান।

৫। বৃক্ষরোপণ ও কেঁচো সার ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা।

৬। জব কার্ড হোল্ডারদের কাজের ব্যবস্থা।

৭। দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৮। কর্মসংস্থানমুখী স্বনিযুক্তি প্রকল্পে বেকার যুবকদের ঋণের ব্যবস্থা করা।

৯। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রসার ঘটানো।

১০। দুয়ারে সরকার কর্মসূচীকে সফল করে তোলা।

১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে একাধিকবার প্রথম স্থান অধিকার করায় আমরা গর্বিত

প্রধান
চম্পা বাউড়ী

উপ প্রধান
শংকর কুমার সাহা

বেলমুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত

(ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

১। বেলমুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিযায়ী শ্রমিকদের জব কার্ড ও ১০০ দিনের কাজ প্রদান করা হয়েছে।

২। আমফান ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের মানকর অধীনস্ত মানুষদের ত্রিপল দেওয়া হয়েছে।

৩। জয়জোহর ও জয়বাংলা প্রকল্পের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।

৪। পিএইচই দপ্তরের মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িতে জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

৫। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে হাঁস ও মুরগী প্রতিপালন প্রকল্পের মাধ্যমে।

৬। ঢালাই রাস্তার প্রকল্পের কাজ চলছে।

৭। দুয়ারে সরকার প্রকল্পকে সফল করেতোলা হয়েছে।

সর্বোপরি মানুষের সাথে মানুষের পাশে সর্বক্ষণ বেলমুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত অঙ্গীকার বদ্ধ।

প্রধান - অসিত মুদি

উপ প্রধান - নারায়ণ মোদক

মান্দড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

(ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

এই গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য

● ইন্দিরা আবাসন ও গীতাঞ্জলি প্রকল্পে গৃহ অনুদান। ● MGNREGS -র গ্রামীণ মজুরদের কর্মদিবস প্রদান এবং কৃষিকাজের সুবিধার্থে চাহিদা অনুযায়ী পুকুর-ক্যানেল, খাল-বিল সংস্কার ইত্যাদি। ● ''জল ধরো... জল ভরো... /কৃষি বাঁচাও... জীবন গড়ো'' এর সার্থক রূপায়ণ। ● স্বচ্ছ গ্রাম পঞ্চায়েত গড়তে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ। ● ''মিশন নির্মল বাংলা''-র লক্ষ্যে পঞ্চায়েতভুক্ত প্রত্যেক পরিবারে শৌচাগার নির্মাণ প্রকল্পে একশ শতাংশ সহায়তা প্রদান। ● সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ। ● ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে ধারাবাহিক আন্দোলনে শরিক। ● পঞ্চায়েতভুক্ত সকল নাগরিককে পঞ্চায়েতমুখী করণ। ● দুয়ারে সরকার কর্মসূচীর সফল রূপায়ণ।

১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে একাধিকবার প্রথম স্থান অধিকার করায় আমরা গর্বিত

প্রধান - নীলিমা মালিক

উপ প্রধান - সাহাদাত পুরকাইত

দশঘরা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত

(ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

১। নারী শিক্ষার দিশা হল কন্যাশ্রী। এটি একটি আর্থিক উৎসাহদান প্রকল্প, যা আজ সারা বিশ্বে সম্মানিত।

২। বাল্যবিবাহ রোধ করে কন্যাশ্রী।

৩। দরিদ্র মেয়েদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য করে কন্যাশ্রী।

৪। প্রতিটি পরিবারে শৌচাগার মহিলাদের নিরাপত্তার প্রতীক।

৫। আসুন শৌচাগার গড়ি, মনের সুখে ব্যবহার করি।

৬। বিলাব কেন মা বোনের মান, রাখব ধরে ঘরে নারীর সম্মান।

দেশের মধ্যে বাংলা একাধিকবার প্রথম স্থান অধিকার করায় ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের সাফল্যে আমরা গর্বিত

আমাদের অঙ্গীকার–

সর্বশিক্ষা, সর্বস্বাস্থ্য ও মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী সহ পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ, রূপায়ণ সহ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে সফল করতে সততা, নিষ্ঠা, দ্রুততা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনে আমরা দায়বদ্ধ।

প্রধান - সাবিনা খাতুন **উপ প্রধান - সঞ্জয় আহিরী**

ভাস্তাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

(ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিশুদ্ধ পানীয় জল ও প্রতিটি গৃহহীন পরিবারের জন্য বাসস্থানের ও বিজ্ঞান সম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। দুয়ারে সরকার ও লক্ষ্মীর ভান্ডার কর্মসূচী বাস্তবায়নে এই গ্রাম পঞ্চায়েত অঙ্গীকারবদ্ধ।

১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে একাধিকবার প্রথম স্থান অধিকার করায় আমরা গর্বিত

প্রধান - জয়ন্ত পাত্র **উপ প্রধান - সীতা সরেন হাঁসদা**

জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল নাগরিকবৃন্দদের জানাই শুভ শারদীয়া ও দীপাবলীর প্রীতি, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা

জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত

(জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

১। একশো দিনের কাজের মাধ্যমে গরীব মানুষের আর্থিকভাবে উন্নয়ন ঘটানো।
২। সকলের জন্য বিশুদ্ধ পাণীয় জলের সুবন্দোবস্ত করা।
৩। বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, এনএফবি এস-এর মাধ্যমে গরীব মানুষের আর্থিক উন্নয়ন ঘটানো।
৪। পিএমএওয়াই/বিএওয়াই, গীতাঞ্জলি প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীন পরিবারকে পাকা গৃহের ব্যবস্থা করা।
৫। বনসৃজনের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধ করা।
৬। প্রতঙ্গ বাহিত ও জলবাহিত রোগজীবাণু সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা।

১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে একাধিকবার প্রথম স্থান অধিকার করায় আমরা গর্বিত

প্রধান - মল্লিকা মন্ডল **উপ প্রধান - সাজাহান মন্ডল**

শারদ শুভেচ্ছা সহ -

মাতৃ মন্দির রাইস মিলস প্রাঃ লিঃ

গুড়াপ, হুগলি

মাতৃ ভূমি রাইস মিলস এলএলপি

মহানাদ, হুগলি

মোঃ - ৭৬৯৯৩১৩৮১৫/৯৯৩২৩৫৬২৬৩

চকদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েত

(জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

বর্তমান রাজ্য সরকারের উন্নয়নমুখী কর্মসূচীগুলি নিম্নলিখিতভাবে রূপায়ন করা আমাদের লক্ষ্য।

১। আই এস জি পি আগামীদিনে আরও উন্নততর গ্রাম পঞ্চায়েত গড়াই আমাদের লক্ষ্য।
২। সামাজিক বনসৃজনে আগামীদিনে ব্লক ও জেলায় প্রথম সারিতে থাকা আমাদের লক্ষ্য।
৩। সকলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, শৌচাগার, কন্যাশ্রী, পেনশন সমূহ আইসিডিএস ও এসএসকে গৃহ নির্মাণ, গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি রূপায়নে আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি।
৪। মহিলা স্ব-সহায়ক দলগুলিকে উপসংঘ ও সংঘ গঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ম্ভর করে তোলা আমাদের লক্ষ্য।
৫। এলাকায় দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যে এবং সেই সাথে কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ প্রদান আমাদের লক্ষ্য।
৬। এলাকার কুষ্ঠ ও টিবি রোগীদের পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান।
৭। এলাকাকে নির্মল করে তোলা পঞ্চায়েতের লক্ষ্য।
৮। দুয়ারে সরকার কর্মসূচীর সফল রূপায়ণ।
৯। লক্ষ্মীর ভান্ডার কর্মসূচীর সফল রূপায়ণ।

প্রধান - অসীমা বাগ

উপ প্রধান - পার্থ প্রতীম শেঠ

শারদীয়া ও দীপাবলীর প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই —

সাটিথান গ্রাম পঞ্চায়েত

(পোলবা দাদপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

মানবিক পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে সকলের সার্বিক উন্নতি সাধনই আমাদের লক্ষ্য।
নির্মল ব্লক ও পানীয় জলের নিরাপদ সুরক্ষা প্রদান আমাদের উদ্দেশ্য।
'কন্যাশ্রী'-র সাফল্যের পাশাপাশি 'শিক্ষাশ্রী', 'রূপশ্রী' ও 'মানবিক' প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়তা সুনিশ্চিত করা
আমাদের একান্ত কাম্য।
'কৃষক বন্ধু' ও 'খাদ্য সাথী' প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলিকে স্বনির্ভরতা প্রদান আমাদের লক্ষ্য।

দেশের মধ্যে বাংলা একাধিকবার প্রথম স্থান অধিকার করায় ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের সাফল্যে আমরা গর্বিত

প্রধান - আশা বাউল দাস **উপ প্রধান - সাইফুদ্দিন ইসলাম**

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ—

ধনিয়াখালি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত

(ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল ও স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী এবং জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে স্থায়ী মানবসম্পদ সৃষ্টি, মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধ, ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধ, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা, কৃষি শ্রমিক ও অসংগঠিত শ্রমিকদের বীমা কর্মসূচীর মাধ্যমে মানুষের চাহিদা পূরণে পঞ্চায়েত অঙ্গীকার বদ্ধ। দুয়ারে সরকার কর্মসূচীর সফল রূপায়ণ।

দেশের মধ্যে বাংলা একাধিকবার প্রথম স্থান অধিকার করায় ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের সাফল্যে আমরা গর্বিত

প্রধান - সন্দীপ টুডু **উপ প্রধান - সোম সিদ্ধান্ত**

ঃঃ শুভ শারদীয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই ঃঃ

ধনিয়াখালি ১ গ্রাম পঞ্চায়েত

(ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

খোলা মাঠে ও রাস্তাঘাটে মলত্যাগ বন্ধ করতে হবে ▸ বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে নিয়মিত শৌচাগার ব্যবহার করতে হবে। ▸ শিশুদের মল শৌচাগারে ফেলতে হবে। ▸ শৌচের পর ও খাবার আগে সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুতে হবে। এই অভ্যাস আপনাকে ৭০ শতাংশ রোগ থেকে মুক্তি দেবে। ▸ গ্রামের পুকুরে গবাদি পশু স্নান করানো ও নোংরা ফেলা বন্ধ করতে হবে। ▸ পানীয় জল বাড়িতে ঢেকে রেখে হাতল দেওয়া মগের মাধ্যমে ব্যবহার করতে হবে। ▸ আপনি যে জল পান করছেন, সেই জল বিশুদ্ধ কিনা তা নিকটবর্তী জল পরীক্ষাগারে নিয়মিত পরীক্ষা করান। ▸ এলাকার পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে একাধিকবার প্রথম স্থান অধিকার করায় আমরা গর্বিত

প্রধান - ববিতা সরেন **উপ প্রধান - সোমনাথ সামুই**

শারদীয়ার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সোমসপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত

(ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

১। মিশন নির্মল বাংলা কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বচ্ছ পঞ্চায়েত গড়ে তোলা।
২। এমজিএনআরইজিএস প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারকে ১০০ দিনের কাজ দেওয়া।
৩। গাছ লাগিয়ে পরিবেশদূষণ রোধ করা।
৪। এলাকার মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলিকে গ্রামবাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
৫। জন্ম ও মৃত্যুর সার্টিফিকেট প্রদান।
৬। দুয়ারে সরকার কর্মসূচীকে সফল করে তোলা।

দেশের মধ্যে বাংলা একাধিকবার প্রথম স্থান অধিকার করায় ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের সাফল্যে আমরা গর্বিত

প্রধান - পুষ্প ভান্ডারী **উপ প্রধান - কার্তিক চন্দ্র দে**

উৎসবের পূণ্যলগ্নে সকলকে জানাই আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা--

বাবনান গ্রাম পঞ্চায়েত

(পোলবা দাদপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

▶ এম.আর.ই.জি.এস. এবং অরণ্য সপ্তাহ ▶ কন্যাশ্রী প্রকল্প ঃ মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের কন্যাশ্রী প্রকল্প এখন বিশ্বে সমাদৃত ▶ স্বাক্ষরতা ঃ স্বাক্ষরতার মাধ্যমে সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা ▶ কমপিউটার প্রশিক্ষণ ঃ কমপিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা ▶ বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা ঃ তৃণমূল স্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবা ▶ বিশুদ্ধ পানীয় নলকূপ ঃ নিরাপদ জলপান, করবে সুস্থ জীবন দান ▶ বিপর্যয় মোকাবিলা ঃ পঞ্চায়েত আপনার পাশে ▶ ঢালাই রাস্তা ও মোরাম রাস্তা ঃ গ্রামীণ যোগাযোগের উন্নতি ▶ দুয়ারে সরকার প্রকল্পকে সফল করা

মিশন নির্মল বাংলা
আমরা পারব। করে দেখাব।

প্রধান - ওয়াসিম রেজা **উপ প্রধান - টুম্পা ধারা**

শারদীয়ার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

(পোলবা দাদপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

১। মিশন নির্মল বাংলা কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বচ্ছ পঞ্চায়েত গড়ে তোলা।
২। এমজিএনআরইজিএস প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারকে ১০০ দিনের কাজ দেওয়া।
৩। গাছ লাগিয়ে পরিবেশদূষণ রোধ করা।
৪। এলাকার মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলিকে গ্রামবাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
৫। জন্ম ও মৃত্যুর সার্টিফিকেট প্রদান।
৬। দুয়ারে সরকার কর্মসূচীকে সফল করে তোলা।

দেশের মধ্যে বাংলা একাধিকবার প্রথম স্থান অধিকার করায় ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের সাফল্যে আমরা গর্বিত

প্রধান - ভারতী মালিক **উপ প্রধান - শুভজিৎ বারিক**

খাজুরদহ মেলকী গ্রাম পঞ্চায়েত

(ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

▶ ঘরে ঘরে শৌচাগার তৈরী, উন্নত নিকাশী ব্যবস্থা, বনসৃজন-এর মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন নির্মল পরিবেশ। ▶ আসুন স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচী মেনে গড়ে তুলি সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ। পরিবেশ, সামাজিক কাঠামো ও পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর উন্নয়নে কাজ করা। ▶ ১০০ দিনের কাজ আরো সফল রূপায়ণের মাধ্যমে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্র প্রসার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। ▶ জনগণকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণ। ▶ 'কন্যাশ্রী'র মাধ্যমে মেয়েদের সামাজিক সুরক্ষা। ▶ দুয়ারে সরকার কর্মসূচীর বাস্তবায়ন।

দেশের মধ্যে বাংলা একাধিকবার প্রথম স্থান অধিকার করায় ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের সাফল্যে আমরা গর্বিত

প্রধান - চায়না মালিক | **উপ প্রধান - বিশ্বজিৎ কুমার**

KPS INSTITUTE OF POLYTECHNIC

FEEDER ROAD–DHANIAKHALI
HOOGHLY–712302

সত্যনারায়ণ কনস্ট্রাকশন

বোসো, ধনিয়াখালি,হুগলি

মোবাইল - ৯৭৩২০৩৬৩৫২

ডিলার-এসিসি,অম্বুজা,জেএসডব্লু,নোভোকো সিমেন্ট

জোতশ্রীরাম গ্রাম পঞ্চায়েত

(জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

- নারী শিক্ষার দিশা কন্যাশ্রী আজ সারা বিশ্বে সমাদৃত।
- একটি আর্থিক উৎসাহদান প্রকল্প হল কন্যাশ্রী। বাল্যবিবাহ রোধ করে কন্যাশ্রী।
- দরিদ্র মেয়েদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য করে কন্যাশ্রী।

আমাদের অঙ্গীকার

সর্বশিক্ষা, সর্বস্বাস্থ্য ও মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী সহ পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ, রূপায়ণ সহ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে সফল করতে সততা, নিষ্ঠা, দ্রুততা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনে আমরা দায়বদ্ধ। আমাদের সকল কাজে সবসময় পাশে রয়েছেন বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী।

প্রধান - আরিফা মন্ডল **উপ প্রধান -সুভাষ রায়**

হার্ট, সুগার, প্রেসার, বাত, নার্ভ, থাইরয়েড, মাথা, পেট বা যেকোন দুরারোগ্য রোগের সুচিকিৎসার জন্য আসুন--

ডাঃ অর্ক মুখোপাধ্যায়

M.B.B.S.M. D. (Medicine) Attached with North Bengal Medical College & Hospital

প্রতি রবিবার সকাল ৯টা হইতে

নবজাতক ও শিশু রোগ বিশেষজ্ঞা -

ডাঃ নির্ঝরিনী ঘোষ

M.B.B.S.

M. D. PEDIATRICS

প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার বেলা ১ টা হইতে।

চেম্বার

ফোনে নাম নথিভুক্ত করে আসুন --

মোঃ -৯১৫৩৬৪৫০১৩

লাইফ লাইন

গুড়াপ (বাজার রোড) হুগলী

M/S BISWESWARI ELECTRICS

VILL+P.O+P.S.
DHANIAKHALI
PH: 9434688683

Electrical Contractor under WBSEDCL

Bulk consultant SLT & HTV–
General order supplier of
ELECTRICAL COMPONENTS

খবর সোজাসুজি পত্রিকার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি --

জনৈক শুভানুধ্যায়ী

পাড়াতল ২ গ্রাম পঞ্চায়েত

(জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)

আমাদের লক্ষ্য ঃ-

১। নির্মল পঞ্চায়েত গড়ার লক্ষ্যে প্রত্যেক বাড়িতে শৌচাগারের ব্যবস্থা করা।
২। জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করা।
৩। গৃহহীন পরিবার গুলিকে গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করা।
৪। পরিশ্রুত পানীয় জলের পর্যাপ্ত যোগান।
৫। বৃক্ষরোপণ ও কেঁচো সার ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা।
৬। জব কার্ড হোল্ডারদের কাজের ব্যবস্থা।
৭। দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
৮। কর্মসংস্থানমুখী স্বনিযুক্তি প্রকল্পে বেকার যুবকদের ঋণের ব্যবস্থা করা।
৯। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রসার ঘটানো।
১০। দুয়ারে সরকার কর্মসূচীকে সফল করে তোলা।

প্রধান - মাবিয়া বেগম সেখ
উপ প্রধান - সরস্বতী টুডু